ইউনিট ৭

উমাইয়া খিলাফত

ভূমিকা

খুলাফায়ে রাশেদীনের অবসানের পর ৬১১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া বংশের শাসন শুরু হয়। উমাইয়া বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুয়াবিয়া (রা)। সিরিয়ার দামেশক ছিল তাঁর রাজধানী। উমাইয়া খলিফাদের শাসন ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। উমাইয়া বংশের মোট ১৪ জন খলিফা রাজত্ব করেন।

উমাইয়া বংশ কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন। আবদে মানাফা আবদে মানাফের ৬ পুত্রের মধ্যে হাশেম, মুত্তালিব ও আবদুশ শামস ছিলেন সহোদর ভাই। হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন হাশেমের বংশধর। আবদুশ শামসের এক পুত্রের নাম উমাইয়া। তাঁর সন্তানরাই উমাইয়া বা বনী উমাইয়া বলে পরিচিতি লাভ করে।

হাশেম তাঁর বদান্যতা, জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য কুরাইশদের নেতা হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তাঁর ভাতিজা উমাইয়া তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। ফলে জাহেলী যুগ হতেই তাদের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং দ্বন্দ্ব চলে। হযরত মুহাম্মদ নবুওয়াত প্রাপ্ত হলে উমাইয়া বংশ রেষারেষির কারণে তা সহজে মেনে নেয়নি। উমাইয়া নেতা আবু সুফিয়ান হাশেমী বংশের মর্যাদা বেড়ে যাবে ভেবে নবীর বিরোধিতা করেন। হযরত মুহাম্মদ তাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। পরবর্তী পর্যায়ে উমাইয়া বংশোদ্ভুত হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর হাশেমী বংশোদ্ভুত খলিফা আলীর (রা) সময়ে পূর্বের বংশগত ঘৃণা জাগ্রত হয়। তারই জের ধরে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের পরিসমাপ্তির পর ৪১ হিজরিতে উমাইয়া শাসনের ভিত্তি রচনা করে। পরবর্তী সময়ে ১৩২ হিজরিতে (৭৫০ খ্রিঃ) একই রেষারেষির জের ধরে হাশেমী বংশোদ্ভুত আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল ছিল ইসলামের সোনালী যুগ। এ সময় কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে পূর্ণ ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিচালিত হত। এ যুগের পর সরকারী ক্ষমতা উমাইয়াদের হাতে চলে আসে। মুয়াবিয়া ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। এ সময় থেকে খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইসলামি গণতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামি রাজতন্ত্র শুরু হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সামনে ধর্মীয় নীতিমালা ও বিধি বিধানকে গৌণ ও পরোক্ষ মর্যাদা দেয়া হয়। এ মতবাদ চালু করার চেষ্টা করা হয় সরকারের প্রতি জনগণ আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য।

উমাইয়াদের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে শাসননীতি ও রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তা হল ঃ

* *ইসলামি গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়।*
* *বায়তুল মাল জনগণের পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়।*
* *মজলিসে শূরার বিলোপ ঘটে। খলিফাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়। জনগণ সরকারের সমালোচনা করার অধিকার হারায়। একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা হয়। নির্বাচনের পরিবর্তে মনোয়ন দ্বারা খলিফা নির্ধারণ করা হয়।*
* *গোত্রীয় দলাদলি, কলহ ও বংশগত হিংসা-বিদ্বেষের পুনরুত্থান ঘটে।*
* *খিলাফত ছিল ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু এখন থেকে তা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। খলিফার ধর্মীয় মর্যাদা লোপ পায়।*
* *খলিফাদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন শুরু হয়।*
* *প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে মদীনার গুরুত্ব লোপ পায়। দামেস্কের গুরুত্ব বেড়ে যায়।*
* *আরব-অনারবি জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠার সুযোগ পায়।*

উমাইয়াদের রাজতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হয়রত মুয়াবিয়া (রা) খুলাফায়ে রাশেদার সদস্য ছিলেন না। তবে তিনি মোটামুটি দু'বছর পর্যন্ত রাসূলের (স) সহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি রাসূলের সাহাবী ছিলেন। তাই তাঁর শাসনামলে ইসলামের আবেগ-অনুভূতি একেবারে কম ছিল না। পরবর্তী মুসলিম রাজা বাদশাহদের চেয়ে অনেকগুণে উত্তম ছিলেন তিনি।

মুয়াবিয়া বংশের শাসন তৃতীয় প্রজন্মের অবসান ঘটলে মারওয়ানের বংশের শাসন কায়েম হয়। উমাইয়াদের মধ্যে উমর ইবনে আবদূল আযীয পুনরায় খিলাফতে রাশেদার রীতিনীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন।

উমাইয়া খিলাফত ১৩২ হিজরি অর্থাৎ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৮৯ বছর পরিচালনা করেন।

উমাইয়া খলিফাগণের বংশ পরিচয় ঃ [৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ]

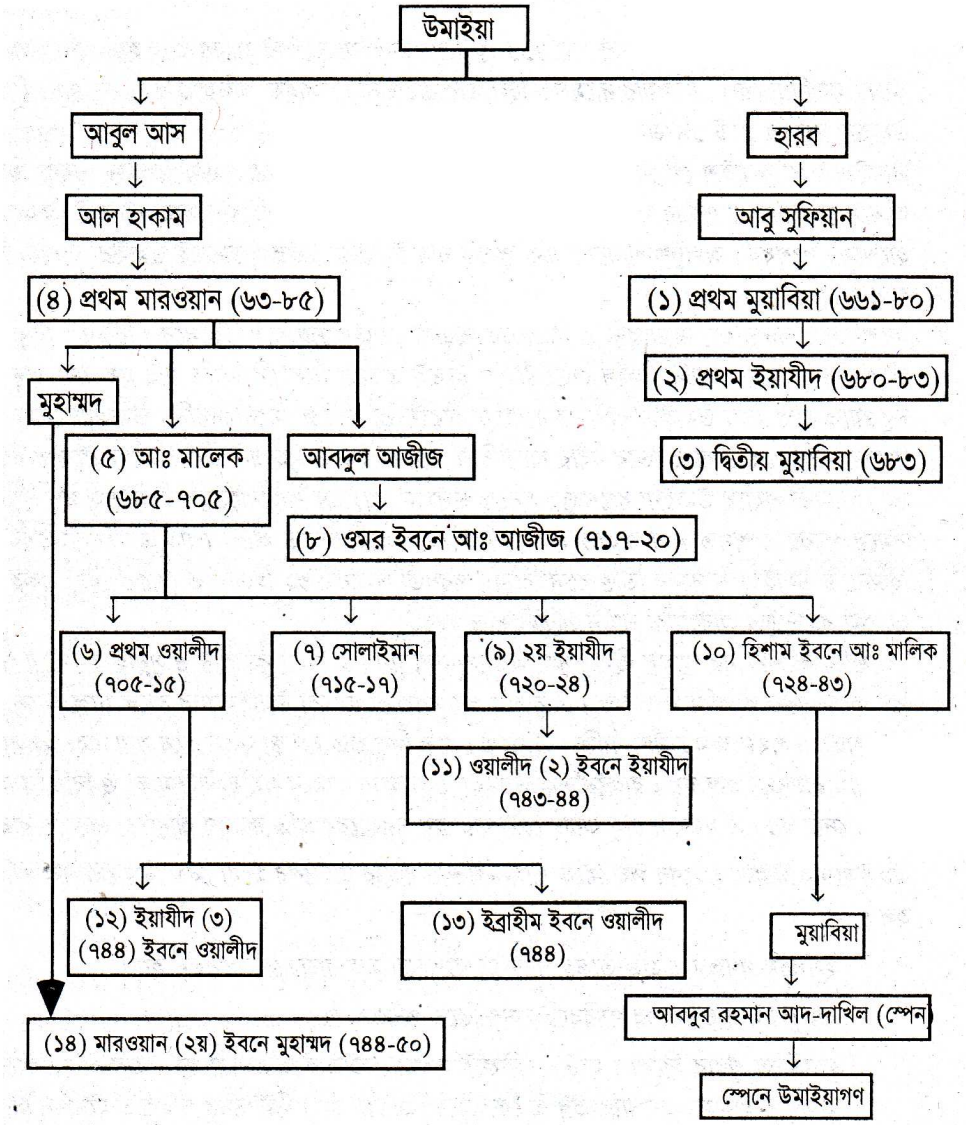

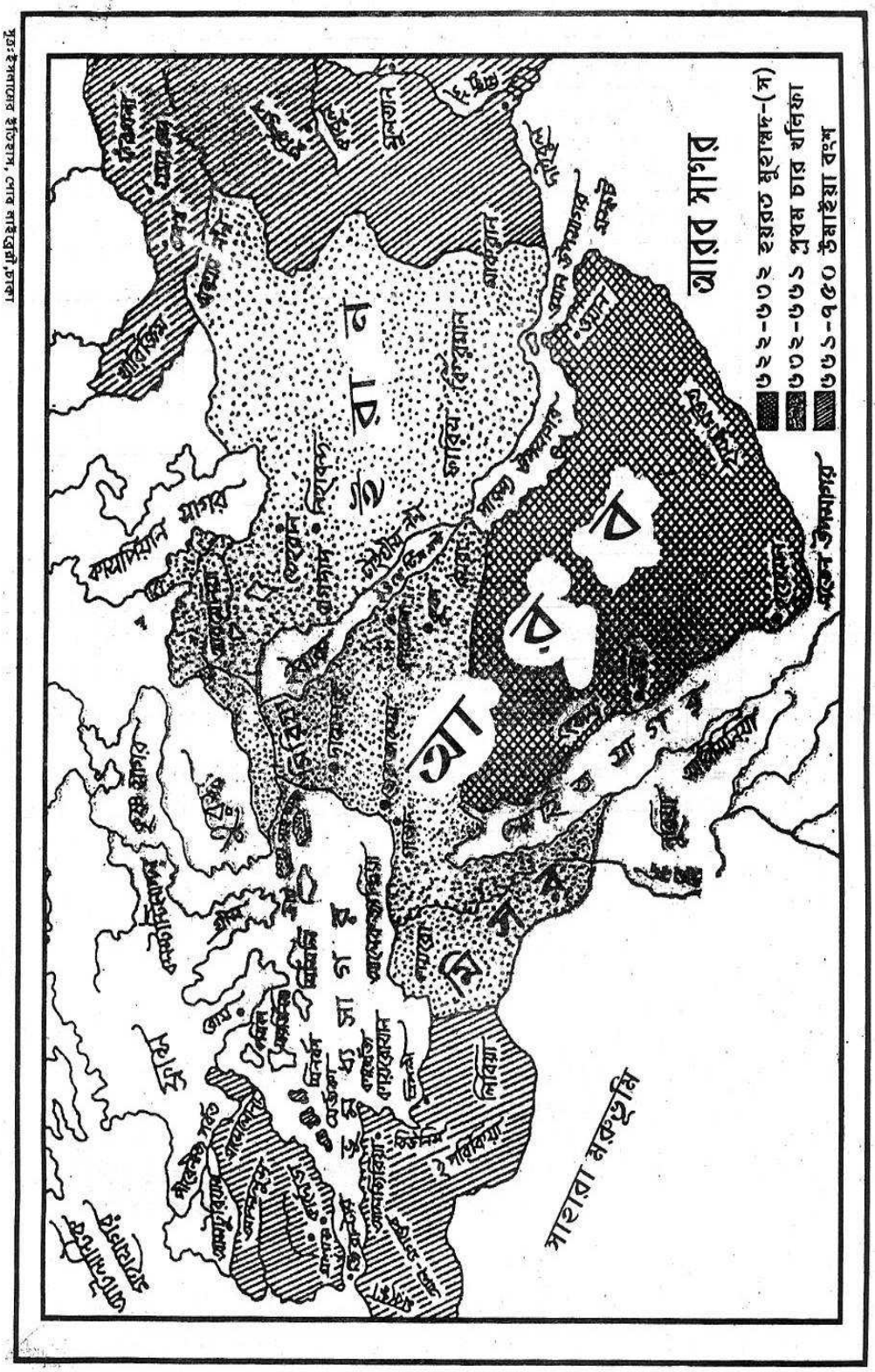

চিত্র-১৯ ঃ আরব সাম্রাজ্য (৬২২-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

১৪ জন উমাইয়া শাসকদের তালিকা ও রাজত্বকাল

ক্রম. নং	শাসকদের নাম	জন্ম	ক্ষমতা লাভ	রাজত্বকাল		
				বৎসর	মাস	দিন
১	মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান		৪১ হিঃ	১৯	৩	২৭
২	ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া	২৬ হিঃ	৬০ হিঃ	৩	৬	১৪
৩.	মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ	৪৩ হিঃ	৬৪ হিঃ	--	১	১০
৪.	মারওয়ান ইবনে হাকাম	৮ হিঃ	৬৪ হিঃ	--	৯	১৮
৫.	আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান	২৬ হিঃ	৬৫ হিঃ	২১	১	১৫
৬.	ওয়ালীদ ইবনে আঃ মালেক	৫০ হিঃ	৮৬ হিঃ	৯	৮	০
৭.	সোলায়মান ইবনে আঃ মালেক	৫৪ হিঃ	৯৬ হিঃ	২	৮	০
৮.	ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ ইবনে মারওয়ান	৬১ হিঃ	৯৯ হিঃ	২	৫	১৪
৯.	ইয়াযীদ (২) ইবনে মালেক	৬৫ হিঃ	১০১ হিঃ	৪	১	০
১০.	হিশাম ইবনে আঃ মালেক	৭২ হিঃ	১০৫ হিঃ	২০	০	০
১১.	ওয়ালীদ (২) ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আঃ মালেক	--	১২৫ হিঃ	১	২	২২
১২.	ইয়াযীদ (৩) ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আঃ মালেক	৮০ হিঃ	১২৬	--	৬	১২
১৩.	ইব্রাহীম ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক	--	১২৬	--	৪	০
১৪.	মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাওয়ান	৭০ হিঃ	১২৭ হিঃ ১৩২ হিঃ	৫	১০	০

পাঠ ১ মুয়াবিয়া (রা) (৬৬১-৬৮০ খ্রি.)-এর প্রাথমিক জীবন ও উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুয়াবিয়া (রা)-কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন
- মুয়াবিয়ার (রা) প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন
- কিভাবে তিনি ক্ষমতারোহন করেন তার বর্ণনা দিতে পারবেন
- উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন।

পরিচয়

হযরত মুয়াবিয়া ছিলেন উমাইয়া বংশের নেতা আবু সুফিয়ানের পুত্র। কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা উমাইয়া গোত্রে মুয়াবিয়ার জন্ম হয় ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মাতা ছিলেন আবু জাহেলের কন্যা হিন্দা। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলামের ঘোর শত্রু। ৮ম হিজরি (৬৩০ খ্রি.) মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর পিতা-মাতাসহ তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। পিতার সাথে কুরাইশদের পক্ষে মুয়াবিয়া রাসূলের (স) বিরুদ্ধে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর মা হিন্দা ইসলামের বিপক্ষে বেশি তৎপর ছিলেন। ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেক পরে। উহুদের যুদ্ধে রাসূলের (স) চাচা বীরশ্রেষ্ঠ হযরত হামযা (রা) শহীদ হলে হিন্দা তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে চরম পৈশাচিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য এজন্য তিনি ইসলামগ্রহণের পর খুবই অনুতপ্ত ছিলেন। রাসুল (স) তাকে তাঁর সামনে না আসার জন্য বলেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

মুয়াবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পরে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ বছর। তারপর রাসূলের (স) ইনতিকাল পর্যন্ত তাঁর সাথেই ছিলেন। হুনাইন যুদ্ধে ও তায়েফ অবরোধে তিনি রাসূলের সঙ্গে ছিলেন।

অহী লেখক

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মুয়াবিয়া নিজেকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত রাখেন। রাসূল (স) মক্কা থেকে মদীনায় চলে এলে তিনিও রাসূলের সাথে মদীনায় চলে আসেন। হযরত মুহাম্মদ (স) মুয়াবিয়ার বোন উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন। মুয়াবিয়া সম্বন্ধে তার ধারণা ভাল ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) মুয়াবিয়াকে বেশ আদর করতেন। আবু সুফিয়ানের অনুরোধে রাসূল (স) মুয়াবিয়াকে (রা) অহী লেখক হিসেবে নিযুক্ত করেন। অহী লেখা ছাড়াও তিনি দূর-দূরান্ত থেকে আগতদের অভ্যর্থনা, থাকা-খাওয়া এবং তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি সমস্ত কাজ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সুষ্ঠুভাবে পালন করতেন। বাল্যকাল লোকেই মুয়াবিয়া, অত্যন্ত ধৈর্য-সহ্য, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনার অধিকারী ছিলেন, সকলেই তাঁর বিচক্ষণতায় মুগ্ধ ছিল।

রাজনৈতিক জীবন

আবু বকর (রা) মুয়াবিয়ার বড় ভাই ইয়াযীদকে একদল সেনার দায়িত্ব দিয়ে সিরিয়ায় পাঠান। সাথে তিনিও ছিলেন। তখন মুয়াবিয়া নিজেও স্বতন্ত্রভাবে কখনও কখনও সেনাবাহিনী দেখাশুনা ও অভিযান পরিচালনায় অবদান রাখতেন। মুয়াবিয়া ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও সুকৌশলী। ১৩ হিজরিতে তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা) তাঁর কর্মতৎপরতা ও বিচক্ষণতা বিবেচনা করে- তাঁকে জর্ডানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তখন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। যখন হযরত আবু ওবায়দা ও তাঁর বড় ভাই ইয়াযীদ মারা যান, তখন উমর (রা) তাঁকে দামেশকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। জর্ডান ও তার আশে পাশের এলাকাও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। হযরত উমরের (রা) ইনতিকালের পর যখন হযরত উসমান (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন সিরিয়া ও এর আশপাশের সমস্ত অঞ্চলের দায়িত্ব মুয়াবিয়ার উপর ন্যস্ত হয়। কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতাও তাঁর হাতে ছিল। সর্বক্ষেত্রে তিনি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সমস্ত সিরিয়ায় ইসলামের শান্তি পতাকা উড্ডীন হয়। মুয়াবিয়া তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা রোমান ও পারসিকদের আগ্রাসন ইচ্ছা চিরতরে বন্ধ করে দেন।

খিলাফত লাভ

সিরিয়ার শাসনকর্তা থাকাকালে মুয়াবিয়া (রা) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের উপর ইসলামি শাসন প্রসারিত করেন। হযরত উসমান (রা)-এর সময় তিনি একটি নৌ বাহিনী গঠন করে। দীপাঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনায় নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করতে থাকে। খলিফা-নির্বাচন নিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অবশেষে সিরিয়া প্রদেশ ছাড়া সমগ্র মুসলিম জাহানই হযরত আলীর (রা) প্রতি সমর্থন জানায়। তবে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ও আলী (রা)-এর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। মুয়াবিয়া নিহত খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর রক্তমাখা জামা এবং তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুল দেখিয়ে বনু উমাইয়া এবং সিরিয়াবাসীদেরকে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন। এরই মধ্যে খিলাফত লাভের কৌশল প্রয়োগ হতে থাকে। হযরত আলী (রা) যখন প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে বরখাস্ত করে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন তখন সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ছাড়া সকলেই এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন। মুয়াবিয়ার (রা) দাবি ছিল আগে হযরত উসমান (রা) হত্যার বিচার হোক, তারপর খিলাফতের প্রশ্ন। অবশেষে মুয়াবিয়া ও আলী (রা)-এর মধ্যে বেশ কিছু যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এবং অনেক প্রাণহানীও ঘটে। সিফফিনের যুদ্ধের পর দুমার সালিশিতে কুটনৈতিক বিজয় লাভ করে মুয়াবিয়া সমগ্র সিরিয়া ও মিশরের উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর হিজরি ৪১ সালে ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফত ত্যাগের মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রা) ইসলামি দুনিয়ার একচ্ছত্র শাসক হয়ে বসেন।

মুয়াবিয়ার (রা)-এর খিলাফত লাভের পদ্ধতি প্রশ্নবিদ্ধ হলেও তাঁর যোগ্যতার ব্যাপারে করো কোন দ্বিমত নেই। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষার্ধ হতেই মুসলিম সাম্রাজ্যে বিশৃংখলা শুরু হয়। মুয়াবিয়া বিশৃংখলার মধ্য দিয়েই মুসলিম জাহানের শাসনভার হাতে নেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার মাধ্যমে এসব গোলযোগের মোকাবেলা করেন। তাঁর ২০ বছরের শাসনামলে সাম্রাজ্যে কোন গৃহ-বিবাদ এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ছিল না বললেই চলে। শাসনকার্যে যেখানে কঠোর হওয়ার প্রয়োজন হত সেখানে তিনি কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। যেখানে তলোয়ার নেওয়া প্রয়োজন হত সেখানে তলোয়ার নিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

দামেস্কে রাজধানী স্থাপন

মুয়াবিয়া শাসনকার্যে ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ। কুটনীতিবিদ, ধৈর্যশীল ও নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে উমাইয়াদের শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য কুফা হতে রাজধানী দামেস্কে স্থানান্তরিত করেন। দামেস্ক ছিল প্রাদেশিক রাজধানী। এখানেই উমাইয়াগণ তাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। বিচক্ষণ মুয়াবিয়া (রা) নিজের শক্তিকে আরো বৃদ্ধি ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রীয় কোন বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমনের সুবিধার্থে দামেস্ককে কেন্দ্রীয় রাজধানী করার উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করেন। রাজতন্ত্র বিশেষত উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুয়াবিয়ার এই রাজধানী পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপন

খারিজীগণ ইরানের উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করেন। খারিজীরা মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এভাবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেমন বসরা, আহওয়াজ প্রভৃতি এলাকায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল তিনি কঠোর হাতে তাও দমন করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

মুদারীয় ও হিমারীয়দের বিরোধ

হিজাজের অধিবাসী মাদের পৌত্র মুদারের নাম থেকে মুদারীয় গোত্রের উৎপত্তি। আর হিমারীয় নামটি উৎসারিত হয়েছে। কাহতান বংশীয় আবদে শামসের পুত্র হিনারের নাম থেকে। মুদারীয় বংশের শাখাগুলোর মধ্যে কুরাইশ, বনু বকর, বনু তাগলিব ও বনু তামীম প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষার ফলে এ গোষ্ঠীর কলহ দূরীভূত হয় এবং পরবর্তীকালে হযরত ওমরের ইন্তিকাল পর্যন্ত অবস্থা শান্ত ছিল। তারপর আবার বিরোধ নতুন করে জেগে উঠে এবং প্রবল আকার ধারণ করে। মুয়াবিয়ার আমলে বিরোধ সংযত হলেও তার মূলোৎপাটিত হয়নি। মুয়াবিয়া বংশীয় বিরোধ কৌশলে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। এভাবে মুসলিম সম্রাজ্যে দীর্ঘ দিনের বিরাজমান বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও গোলযোগ দূর করে মুয়াবিয়া অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তারপর তিনি রাজ্য বিস্তার ও শাসন কাঠামো সংস্কারে মন দেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা। খুলাফায়ে রাশেদীনের গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি প্রথম বংশভিত্তিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের কাছে সবাই হার মেনেছিল, তিনি সাম্রাজ্যের পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১. হযরত মুয়াবিয়া ছিলেন উমাইয়া বংশের নেতা _____ পুত্র।
২. কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা _____ গোত্রে মুয়াবিয়ার জন্ম হয় _____ খ্রিস্টাব্দে।
৩. তাঁর মাতা ছিলেন _____ কন্যা _____ ।
৪. তাঁর পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলামের _____ _____ ।
৫. ৮ম হিজরিতে _____ বিজয়ের সময় তাঁর পিতামাতাসহ তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।
৬. হযরত _____ (রা) তার কর্মতৎপরতা ও বিচক্ষণতা বিবেচনা করে তাঁকে গভর্নর নিযুক্ত করেন।
৭. হযরত উসমানের সময়ে তিনি _____ বাহিনী গঠন করেন।
৮. হযরত আলী (রা) এর শাহাদাতের পর হিজরি সনে ইমাম _____ (রা)-এর খিলাফত ত্যাগের মাধ্যমে মুয়াবিয়া ইসলামি দুনিয়ার একচ্ছত্র শাসক হয়ে বসেন।
৯. হযরত মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন _____ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা।
১০. খুলাফায়ে রাশেদীনের _____ শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি প্রথম _____ ভিত্তিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুয়াবিয়ার পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
২. মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক জীবনের বিবরণ দিন।
৩. মুয়াবিয়ার খিলাফত লাভের বর্ণনা দিন।

হযরত মুয়াবিয়ার (রা) রাজ্য বিস্তার, ইয়াযীদের মনোনয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুয়াবিয়ার (রা) রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন
- মুয়াবিয়ার কোন কোন অঞ্চল জয় করেন তার বর্ণনা করতে পারবেন
- কনস্টান্টিনোপোল অভিযান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন
- পুত্র ইয়াযীদের মনোয়ন বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

হযরত মুয়াবিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি রাজ্য বিস্তার ও প্রসারের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন রণ কৌশলী - বীরযোদ্ধা এবং দুরদর্শী রাজনৈতিক নেতা। তাই তিনি উন্নত সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী গঠন করেন। তার সেনাবাহিনী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। অধ্যাপক হিট্টি বলেন- মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য শুধু সুদূর ও সুসংহতই হয়নি, বরং এর আঞ্চলিক সীমারেখাও বৃদ্ধি পায়।

পূর্বাঞ্চল জয়

হযরত মুয়াবিয়া (রা) জিয়াদকে পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি করে প্রেরণ করেছিলেন। ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে জিয়াদের মুত্যু হলে তার পুত্র ওবায়দুল্লাহ প্রাচ্য বা পূর্বদেশের প্রতিনিধি হন। তিনিও পিতার ন্যায় যোগ্য ছিলেন। এভাবে মুয়াবিয়া (রা) আফগানিস্তান ও পারস্যের অধিকৃত অঞ্চলে অভিয়ান চালিয়ে সীমান্তের উপজাতিদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ৬৬২ খ্রিস্টাব্দে হীরায় বিদ্রোহ দেখা দিলে কঠোর ভাব তা দমন করা হয়। এর দু বছর পরে গজনী, কাবুল, বলখ, কান্দাহার প্রভৃতি এলাকায় বিদ্রোহ দমন অভিযান চালিয়ে উমাইয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাল্লাবের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিন্দু নদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে যিয়াদের এক পুত্র বুখারা দখল করেন। তারপর সময়কন্দ ও তিবরিজ উমাইয়া খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে পূর্বদিকে সমরকন্দ ও বুখারা এবং দক্ষিণ সিন্ধুনদ পর্যন্ত উমাইয়া রাজত্বের বিস্তার ঘটে।

পশ্চিমাঞ্চল জয়

পূর্বদিকের মত মুয়াবিয়ার খিলাফত পশ্চিম দিকেও প্রসারিত হয়। উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে নতুন অঞ্চল সংযোজিত হয়। মুয়াবিয়া ১০০০ সৈন্যসহ ওকবা ইবনে নাফে-এর নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য প্রেরণ করেন। ওকবা শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠা। দেখিয়ে রোমানদেরকে পরাজিত করে সমস্ত উত্তর আফ্রিকা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বাবরিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং কায়রোয়ান নামে একটি শহর একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কায়রোয়ান উত্তর আফ্রিকার রাজধানীতে পরিণত হয়। এর পর তিনি পশ্চিমাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে একের পর এক শহর বন্দর জয় করতে থাকেন। এভাবে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জয় করে ওকবা আটলান্টিক সাগর পর্যন্ত পৌছেন। ওকবার গৌরবময় অভিযান এবং রোমান ও বার্বারদের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে দীর্ঘ দিন যাবত এ এলাকা শান্ত ছিল। মুয়াবিয়া ওকবাকে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিজিত রাজ্যগুলি সুসংহত করার পূর্বে রোমান এবং বাবরিদের যৌথ আক্রমণে ওকবা পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে মুসলমানগণ বার্কায় চলে আসে এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অভিযান থেমে যায়।

কানস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান

খলিফা উসমানের আমলে মুয়াবিয়া সর্বপ্রথম নৌ-বাহিনী গঠন করে সিসিল ও রোডস দখল করেন। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী নৌ-বহরের মোকাবেলা করবার জন্য তাঁকে নৌ-বাহিনী গঠন করতে হয়। আরবদের প্রথম নৌ-সেনাপতি আব্দুল্লাহ-ইবনে কায়েস রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মুয়াবিয়াও নৌ-বহর গঠন করে সিরিয়ার উপকূলভাগ রক্ষা করার প্রয়াস পান। ৬৬২ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া আর্মেনিয়ার রোমানদের পর্যুদস্ত করে আর্মেনিয়া দখল করেন এবং আকব নামক স্থানে একটি পোতাশ্রয় স্থাপন করেন। ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া এ পোতাশ্রয় হতে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে নৌ-অভিযান চালান। এ অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ। তা ছাড়া জার্নাদাহ ইবনে আবী উমাইয়া আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও অন্যান্য সেনাপতিদের দ্বারা প্রতিবার রোমকদের বিরুদ্ধে নৌ-বাহিনী প্রেরণ করা হত। এভাবে কয়েক বছর এথেকে তাদের সাথে নৌ যুদ্ধ চলে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ফলাফল আসেনি।

কনস্টান্টিনোপল সেকালে পূর্ব ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হত। মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সেখানে সুফিয়ান ইবনে আউফের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এ অভিযানের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইঙ্গিত ছিল, তাই অনেক বড় বড় সাহাবী অতি আগ্রহে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে (রা) এ অভিযানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এ অভিযান কালে ইন্তিকাল করেন।

ইয়াযীদের মনোনয়ন

মুয়াবিয়ার (রা) পুত্র ইয়াযীদ ছিলেন একজন উশৃঙ্খল যুবক। খেল-তামাশা, ভ্রমণ ও শিকারেই তার সময় অতিবাহিত হত। কুফার শাসনকর্তা মুগীরাহ এই বলে মুয়াবিয়াকে প্ররোচনা দিলেন যে তার ইন্তিকালের পর তার পুত্র ইয়াযীদই খলিফা হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। অবশ্য মুয়াবিয়া (রা) প্রথম তা মেনে নিতে পারেননি। কেননা ইয়াযীদের চরিত্র খলিফা হওয়ার উপযুক্ত মুয়াবিয়া (রা) কখনো মনে করেননি। কিন্তু মুগীরা ওয়াদা করলেন যে, "আমি কুফাবাসীকে প্রস্তুত করব, যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান বসরাবাসীকে এবং মারওয়ান ইবনে হিমাক মক্কাও মদীনাবাসীকে ইয়াযীদের খিলাফতের অনুকুলে তৈরি করবেন। অন্যদিকে সিরিয়ার মুসলমানগণ কখনো বিরোধিতা করবে না। কাজেই ইয়াযীদের খিলাফতে কোন বাধা নেই, এমনিভাবে কুফার শাসনকর্তা মুগীরার প্ররোচনায় তিনি ইমাম হাসানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিনামার অবমাননা করে নিজ ও গোত্রীয় স্বার্থে ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এ ব্যাপারে তিনি ইরাকীদের সমর্থন লাভ করেন। গণতন্ত্রের আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়ে মুয়াবিয়া বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। মক্কার ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে ইমাম হুসাইন (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর বিরোধীদের অন্যতম ছিলেন।

তাদের বিরোধিতার কতগুলো কারণও ছিল। প্রথমত খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচনে মনোনয়নের কোন নজির ছিল না। দ্বিতীয়ত খলিফা নির্বাচন মদীনার লোকদের একটি বিশেষ অধিকার বলে গণ্য হত এবং তা তারা ত্যাগ করতে কখনো রাজী ছিল না। তৃতীয়ত মুয়াবিয়া (রা) তার নিজ পরিবারের মধ্যেই খিলাফত সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। চতুর্থত ইয়াযীদ ছিলেন অসৎ চরিত্রের অধিকারী। এ সমস্ত কারণে তাদের বিরোধিতাও যুক্তিযুক্ত ছিল।

খলিফা মুয়াবিয়ার ওফাত

খলিফা মুাবিয়া ২৩ বছর সিরিয়া শাসন এবং ১৯ বছর সমগ্র ইসলামি বিশ্ব শাসন করার পর ৬০ হিজরি ১ রজব, অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। দামেস্কের বাবুল জাবিয়া ও বাবুস্‌সগীর এর মধ্যখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুয়াবিয়া (রা) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রথমে রাজ্যের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন, তারপর রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি পূর্বাঞ্চল তথা আফগানিস্তান, গজনী, কাবুল, বলখ, কান্দাহার, বুখারা, সমরকন্দ ও সিন্ধু পর্যন্ত সামাজ্যের বিস্তৃতি ঘটনা। অপর দিকে পশ্চিমাঞ্চলেও তাঁর সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়। তিনি উত্তর আফ্রিকা জর করেন। তিনি বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের নৌবহরের মোকাবেলা করার জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন। তারপর তিনি নিজের অযোগ্য পুত্র ইয়াযীদকে খিলাফতের জন্য মনোনয়ন দেন এবং এজন্য কঠোরতা অবলম্বন করেন। তিনি ৬০ হিজরি অর্থাৎ ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.২

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১. হযরত মুয়াবিয়া কাকে পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন?
২. পূর্বাঞ্চলের কোন কোন এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যযুক্ত হয়?
৩. পশ্চিমাঞ্চলের সেনাপতি কে ছিলেন?
৪. ইয়াযীদ কেমন চরিত্রের লোক ছিল?
৫. ইয়াযীদকে কেন সিংহাসনের জন্য মনোনয়ন দান করা হয়?
৬. মুয়াবিয়া কত বছর রাজত্ব করে কোন সনে ইনতিকাল করেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুয়াবিয়ার পূর্বাঞ্চল বিজয়ের কাহিনী বলুন।
২. ময়াবিয়ার পশ্চিমাঞ্চল অভিযানের বিবরণ দিন।
৩. মুয়াবিয়ার নৌ-অভিযানের সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।
৪. ইয়াযিদ কেমন চরিত্রের ছিলেন? তাঁকে কেন মুয়াবিয়া সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে যান?

মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুয়াবিয়ার (রা) শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন
- তাঁর শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল বর্ণনা দিতে পারবেন
- শাসনকার্যের সুবিধার্থে প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

খলিফা মুয়াবিয়া একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদুনের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী নীতি পরিহার করে পারসিক ও বাইজান্টাইন শাসন পদ্ধতি অনুসারে শাসনকাঠামো গড়ে তোলেন। নিম্নে তাঁর শাসন ব্যবস্থা আলোনা করা হলো।

রেজিস্ট্রী বিভাগ

হযরত মুয়াবিয়া (রা) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনায় এক বিরাট পরিবর্তন আনেন, খলিফা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে লিখিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য তিনি 'দিওয়ান-উল-খাতেম, (বা মোহরাঙ্কন বিভাগ) নামক একটি রাজকীয় চ্যান্সারী পরিষদ বা রেজেস্ট্রী বিভাগ স্থাপন করেন। খলিফা কর্তৃক ঘোষিত প্রতিটি বিধান রেজেস্ট্রীকরণ করা হত, অতঃপর আসল আদেশটি খলিফা মোহরাঙ্কিত করে গন্তব্যস্থলে প্রেরণ করতেন।

ডাক বিভাগ

মুয়াবিয়া (রা) 'দিওয়ানুল বারীদ' বা ডাক বিভাগের স্থাপন করেন। 'সাহিবুল বারীদ' বা পোস্ট মাস্টার কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থাৎ খলিফাকে প্রদেশের উল্লেখযোগ্য খবরা-খবর সম্বন্ধে অবগত করাতেন। এভাবে মুয়াবিয়া (রা) প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয়

মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় শাসনের ফলে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় রাজধানীসমূহে সচিবালয় (Secretariate) স্থাপিত হয়। তাঁর শাসনকালে দু'টি সচিবালয় বর্তমান ছিল। একটি রাজকীয় বা কেন্দ্রীয় অপরটি প্রাদেশিক। কেন্দ্রীয় সচিবালয় আরবি ভাষার মাধ্যমে শাসনকার্য নির্বাহ করা হত। অর্থনৈতিক শাসন ব্যাপারে প্রাদেশিক সচিবালয় গ্রিক এবং ফরাসি (পাহলবি) ভাষার ব্যবহার করত। গ্রিক ভাষা ব্যবহৃত হত খিলাফতের পশ্চিমদিকস্থ দেশসমূহ যথা-মিসর, সিরিয়া প্যালেস্টাইনে আর আরবি ভাষা প্রচলিত ছিল খিলাফতের পূর্বদিকস্থ দেশসমূহে, যথা-ইরাক, (পারস্য) ও সমগ্র মধ্য এশিয়ায়।

অর্থনৈতিক নীতি

অর্থ বিভাগের প্রতি মুয়াবিয়া (রা) এর যথেষ্ট নজর ছিল। অর্থ সংগ্রহের সাথে সাথে তিনি তা আবার অকাতরে দানও করতেন। তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের সমর্থন লাভের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। রাজস্ব ব্যাপারে তিনি উল্লেখযোগ্য উন্নতির সূত্রপাত করেন। তিনি প্রশাসনিক বিভাগ হতে রাজস্ব বিভাগ আলাদা করে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হস্তক্ষেপ হতে এ বিভাগকে মুক্ত রাখেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য 'সাহিবুল খারাজ' নামে উচ্চপদস্থ রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। খলিফা উমরের নীতি অনুসারে যে বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃত্তি মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হত তা থেকে তিনি দরিদ্র কর (যাকাত) কেটে রাখতেন। এতে মোট দেয় অর্থ হতে শতকরা আড়াই ভাগ কমে যেত। এমনিভাবে তিনি রাজস্ব বিভাগে উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করেন।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ

দূরদর্শী শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা) রাজনৈতিক শাসন হতে অর্থনৈতিক শাসনকে পৃথক করে ফেলেন। রাজনৈতিক শাসনের নিমিত্তে তিনি প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সামরিক ব্যাপার এবং জুমার নামাজে ইমামতি করাই ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রধান দায়িত্ব। অর্থের জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সাহিবুল খারাজের উপর নির্ভর করতে হত।

মুসলিম নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠা

সিরিয়ার শাসনকর্তারূপে মুয়াবিয়ার প্রচেষ্টায় খলিফা উসমান (রা)-এর সময় মুসলিম নৌ বাহিনী সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খিলাফত লাভের পর মুয়াবিয়া (রা) একে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। মুসলিম নৌ-বাহিনী তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যকে ভীত কম্পিত করে তুলেছিল।

এরূপে মুয়াবিয়া (রা) মুসলিম সাম্রাজ্যকে আদি রোমান শাসনের কাঠামোর উপর একটি স্থায়ী সুসংহত রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন। বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার ভিতরে তিনি একটি গৌরব দীপ্ত ও সুশৃঙ্খল মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের পত্তন করেন। সুতরাং এটা সত্য যে, মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য কেবল সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়নি। উপরন্তু তা আরো সম্প্রসারিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

খলিফা মুয়াবিয়া (রা) একজন প্রতিভাবান ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করে সমগ্র রাজ্যের মধ্যে সুশাসন প্রবর্তন করেন। তিনি প্রশাসনিক নীতি পরিবর্তন করেন এবং প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষ শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সকল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী নীতি বর্জন করে রোমান ও পারস্যের রাজতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির প্রভাবে প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন। মসলিসে শূরা বাতিল করে একনায়কতন্ত্র চালু করেন। নির্বাচনের পরিবর্তে মনোয়ন প্রথার মাধ্যমে বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সচিবালয়, ডাকবিভাগ, রাজস্ববিভাগ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। তার সময়ে শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৩

এক কথায় উত্তর দিন ঃ

১. দেওয়ানুল খাতেম কি?
২. দেওয়ানুল বারীদ ও সাহিবুল বারীদ মানে কি?
৩. মুয়াবিয়ার সচিবালয় কেমন ছিল?
৪. মুয়াবিয়ার অর্থনৈতিক নীতি কি ছিল?
৫. সর্বপ্রথম কখন কে মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠন করেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুয়াবিয়ার শাখা বিভাগের বর্ণনা দিন।
২. মুসলিম নৌবাহিনী গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

মুয়াবিয়া (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুয়াবিয়ার (রা) চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- মুয়াবিয়ার (রা) কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন
- শাসক ও মানুষ হিসেবে মুয়াবিয়া (রা) কেমন ছিলেন তা বলতে পারবেন।

মানুষ হিসেবে হযরত মুয়াবিয়া

মহানবী (স) রাজ্যশাসন ও রাষ্ট্রনীতির যে দর্শন বাস্তবায়িত করে উত্তরসূরী খলিফাদের জন্য রেখে যান তার নাম খিলাফত। মহানবীর (স) তিরোধানের মাত্র তিন দশকের পর সেই খিলাফত ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা ধুলিস্যাৎ করে তার স্থলে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইসলামের ইতিহাসে বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব। হযরত আলী (রা)-এর সাথে নীতিগত বিরোধ ও হত্যাকাণ্ড, হযরত ইমাম হাসান (রা)-কে খিলাফতের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা, খিলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তর ও মদীনা থেকে দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তর ইত্যাকার কার্যাবলীর কথা বাদ দিলে সাম্রাজ্যকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তিনি যে সাংগঠনিক ভূমিকা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। অপরিসীম কর্মকুশলতা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা একটি ইতিহাসের সমাপ্তি টেনে নতুন ইতিহাসের জন্মদাতা হিসেবে তার ব্যক্তিত্ব অনন্য সাধারণ। মানুষ ও শাসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ধারক। প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি গুণগ্রাহীদের হৃদয় জয় এবং জনসাধারণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। জনগণের বশ্যতা ও আনুগত্যের জন্য তিনি কূটনীতি ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ এবং অকাতরে অর্থও ব্যয় করেছেন। পিতার অবৈধ পুত্র যিয়াদকে আপন ভ্রাতা হিসেবে প্রকাশ্যে গ্রহণ করতেও তিনি এতটুকু দ্বিধা করেননি।

চরম উচ্চাভিলাষী ঃ তিনি ছিলেন চরম উচ্চাভিলাষী। মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হওয়ার উচ্চাভিলাষে তিনি সুচতুর পরিকল্পনায় এগিয়ে যান। তিনি হযরত আলীর (রা) সাথে বিরোধ বাঁধিয়ে রাখেন। সিফফীনের যুদ্ধে পরাজিত হয়েও কূটকৌশলে 'দুমাতুল জন্দল'-এর মিমাংসার ছলনা করেন। হযরত আলী (রা) তাঁর দুরভিসন্ধির শিকার হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং সাথে সাথে অবসান ঘটে খিলাফতের। মুয়াবিয়া (রা) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আর মুসলিমরা চিরতরে হারায় তাঁদের নবীর (স) প্রদর্শিত খিলাফত ব্যবস্থা।

দক্ষতা ও কূটকুশলতা ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে অনেক কিছুই করেছেন। তাঁর দক্ষতা, কূটকৌশল, দূরদর্শিতা এবং অবিরাম সাধনা বলে একেবারে নিম্নস্তর থেকে সফলতার সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষমতাকে শক্ত হাতে রক্ষা করেন। বিপক্ষকে কাবু করার জন্য এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত।

শ্রেষ্ঠ সংগঠক ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন ধীর-স্থির মস্তিষ্ক এবং অত্যন্ত সাবধানী। বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তিনি কৌশলের সাথে পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যেতেন, স্বার্থের খাতিরে যেখানে যেমন ব্যবহার তা প্রয়োগ করতেন। কখনো নম্র ব্যবহার দিয়ে, কোথাও অর্থ দিয়ে, কোথাও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করায় তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন। এ শক্তি বলেই তিনি শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতা ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলকে সমান চোখে দেখতেন। তাঁর সুশাসনে প্রজারা সুখ-শান্তিতে বসবাস করতেন।

গুণীদের কদর ও পৃষ্ঠপোষকতা ঃ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি গুণীজনদের কদর ও সম্মান করতেন। তিনি দক্ষতার কারণে বহু অমুসলিমকেও রাজকার্যে নিয়োগ করেছেন। একজন খ্রিস্টান তাঁর প্রধান উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খ্রিস্টান চিকিৎসক 'ইবনে আসল'-এর দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের কয়েকটি পুস্তক আরবিতে অনুবাদ করান। 'আল-আখতাল' নামক খ্রিস্টান কবি তাঁর সভাকবি ছিলেন।

ব্যক্তি মুয়াবিয়া ঃ মুয়াবিয়া (রা) উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি এবং স্থূলকায় ছিলেন। শাসক হিসেবে কূটকৌশলী হলেও ব্যক্তি মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিবান এবং ধর্মানুরাগী। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে তিনি ব্যক্তি হিসেবে বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। কেউ কেউ তাঁকে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, অসৎ ও দ্বীনী কাজে বাহ্যিক নিষ্ঠাবান বলে অভিহিত করেছেন। অনেকের মতে জাগতিক স্বার্থ হাসিলই ছিল তাঁর ধর্ম।

রাজাসূলভ আচরণ ঃ তিনি নিজেকে পারস্য ও রোমান রাজাদের মত আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমক দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখতেন। তিনি প্রাসাদে সশস্ত্র সৈনিক ও দেহরক্ষী রাখতেন। নিজের মতেই কাজ করতেন। মজলিসে শুরার কোন ধার ধারতেন না।

ঐতিহাসিকগণ শাসক হিসেবে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ-
সুশাসক ঃ শাসক হিসেবে হযরত মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি ছিলেন অতিশয় দয়ালু এবং সুবিবেচক। তাঁর শাসনামলে শাসক ও শাসিত পাশাপাশি বসবাস কর। একজন সুশাসকের সব গুণাবলী তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) শাসক হিসেবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ, সুশাসক এবং সুচতুর সাম্রাজ্য সংগঠক হিসেবে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নিজকার্য সিদ্ধির জন্য যে কোন পন্থায় শত্রুদের বশে আনতে পারঙ্গম ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধৈর্য্য, শান্ত ও ধীরচেতা পদক্ষেপ, অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা, কূটকুশলতা রাজনৈতিক ভাবের দ্বারা তিনি সফল রাজনীতিবিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

কূটনীতিবিদ ঃ তিনি ছিলেন একজন সার্থক কূটনীতিবিদ। রাষ্ট্র শাসনে এবং ক্ষমতা পাকাপোক্তকরণে তাঁর কূটনীতি যথেষ্ট ফলপ্রসু হয়েছিল। তাঁর কূটনীতির কাছে তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও হেরে যেত এবং তাঁর করতলগত হত শিশু বালকের মত।

শান্তি-শৃঙ্খলা বিধায়ক ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্র শাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি আনয়নে সক্ষম হয়েছিলেন। পি, কে হিট্টির মতে, "বিশৃংখলার মধ্য হতে মুয়াবিয়া (রা) শৃংখলা আনয়ন করেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।"

একটি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) মহানবী (স) প্রতিষ্ঠিত ও প্রদর্শিত 'খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়ত" ব্যবস্থাকে উৎখাত করে উমাইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর হাতেই একটি ইতিহাসের অপমৃত্যু হয় আর নতুন ইতিহাসে উমাইয়া যাত্রা শুরু করেন। ঐতিহাসিক আমীর আলির মতে "দামেশ্‌কে মুয়াবিয়া (রা) সিংহাসনারোহণ খিলাফতের সমাপ্তি, রাজতন্ত্রের প্রারম্ভ সূচনা করে।'

সুষ্ঠু প্রশাসনিক বিন্যাসক ঃ মুয়াবিয়া (রা) খলিফায়ে রাশিদীনের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও ইসলামি জাতীয়তাবাদী নীতিগুলো সম্পূর্ণরূপে ধূলিস্মাৎ করে পারস্য ও বাইজানটাইন শাসন পদ্ধতির প্রভাবে প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠন করেন। তিনি 'মজলিশ-উশ-শুরা' বাতিল করেন এবং নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন দ্বারা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে তাঁকে Father of a dynasty (একটি বংশের প্রতিষ্ঠাতা) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কেন্দ্রীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা ঃ কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনের জন্য তিনি রাজধানী দামেস্কে একটি সচিবালয় বা সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করেন। এ সচিবালয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যোগদান করে মুয়াবিয়া (র)-কে নানা বিষয়ে অবগত করাতেন এবং তিনি তাঁদেরকে নির্দেশনা দিতেন। শাসনের কেন্দ্রীয়করণের দ্বারা সমগ্র রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় ছিল।

ডাক ব্যবস্থা চালু ঃ ইসলামি রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম তিনিই ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। উট ও ঘোড়ার সাহায্যে তিনি সরকারী ও বেসরকারী চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতি ১১ মাইল অন্তর একটি ডাকঘর স্থাপন করেন।

রেজিস্ট্রি দফতর স্থাপন ঃ রেজিস্ট্রি দফতর প্রবর্তন মুয়াবিয়ার (রা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ বিভাগের নাম ছিল 'দীউয়ান-উল-খাতিম'। কেন্দ্র ও প্রদেশের সরকারী কার্যাদি, নির্দেশনাবলীতে খলিফার মোহর বা সীল দিয়ে সংরক্ষণ করা হত এবং মোহরাঙ্কিত করে অনুলিপি বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হত। এতে জালিয়াতি বন্ধ হয়ে যায়।

রাজস্ব বিভাগের পুনর্গঠন ঃ প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম পদক্ষেপ ছিল রাজস্ব বিভাগের পুনর্গঠন। প্রশাসন থেকে এ বিভাগকে আলাদা করে রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুসংহত করেন। এ বিভাগের প্রধান 'সাহিব-উল-খারাজ খলিফার নিকট হিসাব-নিকাশের জন্য দায়ী থাকতেন। এতে প্রাদেশিক গভর্নরদের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করে।

নৌ ও সেনা বাহিনী সংগঠন ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন গোত্রভিত্তিক সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল বাহিনী গঠন করে সাম্রাজ্যকে শাক্তিশালী করেন। তাছাড়া তিনি পুলিশ বিভাগ ও কৃষি বিভাগেরও উন্নয়ন সাধন করেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুয়াবিয়া (রা) মানুষ ও শাসক হিসেবে ছিলেন এক অনন্য সাধারণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব। তিনি নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেন। ইসলামি আদর্শ পরিপন্থী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে নিন্দিত হলেও তিনি আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপতির আসনে সমাসীন ছিলেন। পি.কে. হিট্টি যথার্থই বলেছেন- He was not only the first but also one of the best of Arab kings." বস্তুত শাসক হিসেবে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা তাকে মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকদের মর্যাদা দান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৪

অল্প কথায় বিবরণ দিন-

১. "মুয়াবিয়া ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তি।"
২. "মুয়াবিয়া ছিলেন চরম উচ্চাভিলাষী।"
৩. "মুয়াবিয়ার দক্ষতা ও কূটকুশলতা।"
৪. "শ্রেষ্ঠ সংগঠক ছিলেন মুয়াবিয়া।"
৫. মুয়াবিয়া ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষ হিসেবে মুয়াবিয়ার চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।
২. শাসক হিসেবে মুয়াবিয়ার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৫ ইয়াযীদ (৬৮০-৬৮৩ খ্রি.) ঃ কারবালার বিষাদময় ঘটনা ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ইয়াযীদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ইয়াযীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- ইয়াযীদের খিলাফত লাভের বর্ণনা দিতে পারবেন
- ইয়াযীদ ও ইমাম হুসাইনের মধ্যকার বিরোধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন
- কারবালার ঘটনা, এর কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ইয়াযীদের প্রাথমিক জীবন

মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ ২৫ বা ২৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় মুয়াবিয়া সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। ইয়াযীদের মায়ের নাম ছিল মাইসুন বিনতে বাহদাল। মা ছিলেন কিলাব গোত্রের মহিলা। ইয়াযীদ ছিলেন শারীরিকভাবে শক্তিশালী পুরুষ। বাল্যকাল হতেই রাজ পরিবারে লালিত পালিত হয়েছিলেন। কাজেই তার মধ্যে দাম্ভিকতার ভাব ছিল অত্যন্ত তীব্র।

মুয়াবিয়া ছিলেন তীক্ষ্ণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। শিশু ইয়াযীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে বাল্যকাল হতেই অত্যন্ত কড়া দৃষ্টি রাখতেন। ভাষা শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুয়াবিয়া (রা) ইয়াযীদকে গ্রাম অঞ্চলে পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানকার ভাষা ছিল বিশুদ্ধ ও রক্ষণশীল। মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে দু'বার আমীরে হজ্জ করে পাঠিয়ে ছিলেন। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বও তাঁকে দেয়া হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের এক অভিযানে ইয়াযীদ ছিল সেনাপতি।

চরিত্র

ইয়াযীদ ছিল ব্যক্তিগত জীবনে পাপাসক্ত ও দুশ্চরিত্রের অধিকারী। নিষ্ঠুরতা, অধর্মিকতা, মদ্যপান ও ইন্দ্রীয়পরায়নতা তার চরিত্রকে কলুষিত করে রেখেছিল। শিকারের প্রতি ছিল তার খুব ঝোঁক। যখন তার পিতা মুয়াবিয়া (রা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন ইয়াযীদ দামেস্কে ছিল না। লোক পাঠিয়ে তাকে ডাকা হয়। মুয়াবিয়া (রা) তাকে কিছু উপদেশ দেন। ইয়াযীদ উপদেশ শুনার পরই পুনরায় শিকারের উদ্দেশ্যে দামেস্কের বাইরে চলে যায়। কাজেই পিতার মৃত্যুর সময়ও উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু পরে এসে পিতার কবরের উপর জানাযা পড়েছেন। রাজ পরিবারে লালিত পালিত ইয়াযীদ বাল্যকাল হতেই ছিলেন স্বাধীনতা প্রিয়। ধর্মীয় দিক দিয়ে ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। তার সাড়ে তিন বছরের শাসনকাল তিনটি ঐতিহাসিক দুষ্কর্মের জন্য কুখ্যাত। (১) কারবালার হত্যাকাণ্ড (২) মদীনা আক্রমণ (৩) কাবা গৃহে হামলা।

ক্ষমতা লাভ

৬৬১ খ্রিস্টাব্দে হযরত হাসান (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত ছিল যে মুয়াবিয়া (রা)-এর ইন্তিকালের পর ইমাম হুসাইন (রা) মুসলিম উম্মাহর ইচ্ছানুযায়ী খলিফা হবেন। ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইমাম হাসান (রা)-এর মৃত্যু হলে মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইবনে শো'বার পরামর্শে সে চুক্তি ভঙ্গ করেন। তিনি নিজের মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র ইয়াযীদই মুসলিম জাহানের খলিফা হবেন বলে ঘোষণা করলেন। এমনকি তাঁর জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরের মাধ্যমে ইয়াযীদের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন মুয়াবিয়া (রা) ইন্তিকাল করেন, তারপর তাঁর মনোনয়ন অনুসারে স্বীয় পুত্র উশৃঙ্খল ও অনুপযুক্ত ইয়াযীদ ৩৪ বছর বয়সে মুসলিম জাহানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যার ফলে গণতান্ত্রিক নিয়মে খলিফা নির্বাচন পদ্ধতির অবসান ঘটে এবং মনোনয়ন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনেকেই তার প্রতি আনুগত্য স্থাপনে অনিচ্ছা জানায়। এরূপ পরিস্থিতিতে খিলাফত লাভের আশায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করে মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। এতে গণ্যমান্য অনেকেই ইয়াযীদের খিলাফতকে অবৈধ বলে তাকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর সাথে দ্বন্দ্ব

মদীনার গভর্নর ছিলেন ওলীদ ইবনে ওতবা। তার উপদেষ্টা ছিলেন মারওয়ান ইবনে হাকাম। মারওয়ানের পরামর্শ ছিল হোসাইন (রা)-কে ইয়াযীদের নামে বাইয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে যেন দেরি করার সুযোগ না দেয়া হয়। কিন্তু ওলীদ তার পরামর্শ গ্রহণ করেনি। যার ফলে হুসাইন (রা) মক্কা চলে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। মারওয়ান এ খবর ইয়াযীদকে

দেয়ার সাথে সাথেই ইয়াযীদ ওলীদকে অপসারণ করে আমর ইবনে সাঈদকে মদীনার গভর্নর করে পাঠালেন। মক্কাবাসী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে, এ খবর শুনে ইয়াযীদ আমরকে মক্কা গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। আমর সৈন্য নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হন কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের হাতে সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করেন।

হযরত হুসাইন (রা) যদিও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি। তবুও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হযরত হোসাইন (রা) সাথে পরামর্শের ভিত্তিতেই কাজ করতেন। ইমাম হোসাইন দামেস্কে প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানালেন যে, ইয়াযীদের খিলাফত দাবি ভিত্তিহীন। তাই তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করা যায় না। কেননা মুয়াবিয়া ও হাসান (রা)-এর মধ্যে যে বোঝাপড়া হয়েছিল এতে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর ইচ্ছানুযায়ী হুসাইন (রা)-ই খিলাফতের মসনদে বসার কথা। হুসাইন (রা)-এর এ প্রতিবাদে দীর্ঘদিন যাবত মুয়াবিয়া শাসিত দামেস্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যোগ্য, ধর্মপরায়ণ ও ন্যায় বান হিসেবে ইয়াযীদ অপেক্ষা তিনিই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ব্যক্তি। কাজেই গণতন্ত্র ও খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ইয়াযীদের নিকট মাথা নত না করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। হিজাজের আলী সমর্থকগণও হুসাইন (রা)-এর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে। ফলে আলী ও মুয়াবিয়ার শাসনকালে রোপিত সংঘর্ষের বীজ তাদের পুত্রদের আমলে সর্বনাশা বিষে রূপান্তরিত হয়।

এ সময় ইরাকীরাও হুসাইনকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। হুসাইনের বহু হিতৈষী কুফাবাসীদের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা না আনার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। যাত্রার পূর্বে কুফার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য হুসাইন (রা) তার জ্ঞাতি ভাই মুসলিম ইবনে আকিলকে প্রেরণ করেন। আর তাঁকে এ কথা বলে দেন যে, তুমি গোপনভাবে কুফায় পৌঁছবে এবং গোপনেই থাকবে এবং গোপনেই আমার লোকদেরকে বাইয়াত করিয়ে আমাকে অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিবে। মুসলিম অত্যন্ত সংগোপনে কুফা পৌঁছলেন এবং মুখতার ইবনে উবাইদার বাড়ি আশ্রয় নিলেন। আস্তে আস্তে তার আগমনের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক মুসলিম ইবনে আকিলের হাতে হযরত হোসাইন (রা)-এর জন্য বাইয়াত হতে লাগল। প্রথমদিনেই বার হাজার লোক বাইয়াত গ্রহণ করলেন। মুসলিম কুফার অবস্থা অত্যন্ত অনুকুল মনে করে হুসাইন (রা)-কে কুফা চলে আসার জন্য কায়েস ও আব্দুর রহমান নামক দুই জনকে পত্র দিয়ে পাঠান। হযরত হুসাইন (রা) কুফা আসার আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠালেন। এদদিকে মুসলিমের হাতে কুফাবাসীর বাইয়াতের কথা ইয়াযীদ সংবাদ পেয়ে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর করে পাঠায়। উবাইদুল্লাহ অসংখ্য নৈস্য নিয়ে কুফায় উপস্থিত হয়। মুসলিম উবাইদুল্লাহর খরব পেয়ে মুখতার ইবনে উবাইদার বাড়ি ত্যাগ করে অত্যন্ত সংগোপনে হানী ইবনে ওরোয়ার বাড়ি আশ্রয় নেন। এতদিনে কুফায় হোসাইন (রা) বাইয়াতকারীদের সংখ্যা ১৮ হাজারে পৌঁছে যায়। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কুফাবাসীদেরকে পুনরায় ইয়াযীদের দিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি নানা চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলিম ইবনে আকিলকে বন্দী করেন এবং পরে হত্যা করে দরজায় ঝুলিয়ে রাখেন। আর তার শির দামেস্কে ইয়াযীদের নিকট প্রেরণ করে।

কারবালার বিষাদময় ঘটনা

কুফা ছিল তৎকালীন আরবের একটি প্রদেশ যা মক্কা-মদীনার উত্তরে অবস্থিত। কুফার প'চিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে ফোরাতের কোল ঘেঁষে অবস্থিত কারবালা প্রান্তর। হিজরি ৬০ সনে ইমাম হোসাইন (রা) ও ইয়াযীদের মধ্যে সেখানে যে ঐতিহাসিক সংঘর্ষ হয় তা কারবালার ঘটনা নামে পরিচিত।

কারবালা ঘটনার কারণ

হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযিদের শাসনামলে কারবালার নৃশংস ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ইতিহাসকে কলংকিত করেছিল। এ ঘটনায় মানবতা চরমভাবে ভূ-লুণ্ঠিত হয়। এজন্য ইয়াযিদের সময়কালকে উমাইয়া বংশের কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে অভিহিত করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ইয়াযীদ কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হবেন।

চুক্তির অবমাননা ঃ কারবালা যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল হাসান-মুয়াবিয়ার সন্ধির অবমাননা। তাদের মাঝে সন্ধি হয়েছিল যে মুয়াবিয়ার (রা)-এর মৃত্যুর পর হুসাইন খলিফা হবেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে হোসাইন (রা)-এর স্থলে ইয়াযীদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন যা ইমাম হুসাইন (রা) নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারেননি। ফলে সংঘটিত হয় কারবালার হত্যাকাণ্ড।

ইয়াযীদের বিলাসিতা ঃ ইয়াযীদ ক্ষমতায় বসেই ইসলামি বিধানকে অমান্য ও অবমাননা করে আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। এমনকি মদ ও গান-বাজনা নিয়েও তিনি ব্যস্ত থাকতেন। তার এহেন কার্যকলাপে প্রকৃত ধর্মভীরু লোকজন ক্ষেপে যায়।

ইয়াযীদের প্রতি ঘৃণা ঃ ইয়াযীদের ব্যক্তি চরিত্র ও যোগ্যতা কখনো খলিফা হওয়ার উপযুক্ত ছিল না। অপরদিকে হযরত হোসাইন (রা) ছিলেন ইয়াযীদ থেকে সার্বিক গুণে শ্রেষ্ঠ। ধার্মীকতায় ন্যায় পরায়ণতা ও যোগ্যতার দিকে বিবেচনা

করে সকল ধর্মভীরু লোক ইয়াযীদের পরিবর্তে হোসাইন (রা)-কেই খলিফা হওয়ার উপযুক্ত মনে করতেন। ফলে হোসাইন (রা) ও ইয়াযীদের মধ্যে একটি সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

মারওয়ানের ষড়যন্ত্র ঃ মারওয়ান ইমাম হুসাইনকে দারুণভাবে ভয় করতেন। ইমাম হুসাইন খলিফা হলে তার অসুবিধা হবে ভেবে পূর্ব থেকেই ইয়াযীদের পক্ষাবলম্বন এবং হুসাইনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। পরিণতিতে সংঘটিত হয় কারবালার হত্যাকাণ্ড।

ইয়াযীদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি ঃ কারবালায় সংঘর্ষকে উদ্দেশ্য করে হোসাইন (রা) মক্কা হতে কুফার দিকে রওয়ানা করেননি। তিনি পথিমধ্যে যখন শুনলেন মুসলিম নিহত হয়েছে, তখন কুফাবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারলেন। এদিকে হুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি মক্কার দিকেও প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ পাননি। ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে কারবালার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল।

কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা ঃ কারবালা যুদ্ধের এক বিশেষ কারণ ছিল কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যাবলী। ইমাম হোসাইন (রা)-কে তারা স্বেচ্ছায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। হুসাইন (রা) পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য চাচাত ভাই মুসলিমকে কুফা পাঠালেন। তাদের মধ্যে ১৮ হাজারের মত লোক মুসলিমের হাতে হযরত হুসাইন (রা)-এর জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেও পরে তা ভঙ্গ করে ইয়াযীদের পক্ষ অবলম্বন করে। ইমাম হোসাইন (রা) কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার কিছুই জানতে পারেননি।

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ মুয়াবিয়া (রা) তার জীবদ্দশায়ই নিজের পুত্র ইয়াযীদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে মারাত্মক ভুল করেছিল। ইয়াযীদ ছিলেন খলিফা হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এ অন্যায় পথে খিলাফত প্রদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন হযরত হুসাইন (রা)। তিনি ইয়াযীদের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহের জন্যই কুফাবাসীদের বাইয়াত নিতে আগ্রহী ছিলেন। অবশেষে যখন কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে রওয়ানা করলেন পথিমধ্যেই কারবালার যুদ্ধ ঘটে। বস্তুত বুঝা যায় রাজতন্ত্র ও অযোগ্য লোকের খিলাফতের বিরোধিতা করার কারণে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে।

ইয়াযীদকে অস্বীকার ঃ আমীরে মুয়াবিয়া কর্তৃক মনোনীত ইয়াযীদের খিলাফতকে মক্কা, মদীনা ও কুফার জনগণ মেনে নিতে অস্বীকার করে। বিশেষ করে তার অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও পাপাচারপূর্ণ জীবন ধর্মভীরু মুসলমানদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

ইমাম হুসাইনের বলিষ্ঠতা ঃ ইমাম হুসাইন (রা) ছিলেন ঈমানী শক্তিতে অত্যন্ত বলীয়ান ও নিষ্ঠাবান। পক্ষান্তরে ইয়াযিদ ছিলেন মদ্যপায়ী, ইন্দ্রীয়পরায়ণ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ। তাই হুসাইন (রা) কোনক্রমেই ইয়াযিদের কাছে নত ও বাইয়াত গ্রহণ করতে রাজী হননি। প্রয়োজনে তিনি জীবন দিতেও প্রস্তুত হন।

মদীনার গুরুত্ব হ্রাস ঃ মদীনার পরিবর্তে দামেস্কে রাজধানী স্থাপনে মদীনার গুরুত্ব হ্রাস পায়। এছাড়া ইয়াযিদের ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী কার্যকলাপে মক্কা ও মদীনার ধর্মভীরু, সৎ ও নিষ্ঠাবান সাহাবীরা ইয়াযিদের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

গোত্রীয় বিরোধ ঃ দীর্ঘদিন ধরেই উমাইয়া ও হাশিমী গোত্রের মধ্যে বিরোধ ছিল। ইয়াযিদ ছিলেন উমাইয়া গোত্রের। তিনি উভয় গোত্রের বিরোধকে পুনরায় জাগ্রত করে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। ফলে কারবালার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

কারবালার ঘটনা

হুসাইনের কুফা যাত্রা ঃ ইমাম হুসাইন (রা) ইয়াযিদকে দমন করার উদ্দেশ্যে কুফাবাসীদের সাহায্য নিতে ৬০ হিজরির ৩ যিলহাজ্জ তারিখে ২৪০ জন পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়সহ মক্কা হতে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যদিও অনেকেই তাঁকে কুফা যেতে বারণ করেছিলেন; তবুও দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগোতে থাকলেন।

উবাইদুল্লাহর প্রতিরোধ ঃ ইমাম হুসাইন কুফার নিকটবর্তী হলে হঠাৎ করে হোর নামক এক আরব সর্দারের অশ্বারোহী বাহিনী তাঁর গতিরোধ করে। ফলে হুসাইনের দলটি ফোরাত নদীর পশ্চিম তীর ধরে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। অল্পদূর যেতেই উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কর্তৃক প্রেরিত এবং আমর ইবনে সাদে'র নেতৃত্বে পরিচালিত চার হাজার উমাইয়া সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী তাঁদের গতিরোধ করে। হুসাইন (রা) অনন্যোপায় হয়ে কুফার পঁচিশ মাইল উত্তর-

পশ্চিমে ফোরাতকূলের কারবালা প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। আর শত্রু-সৈন্যরা পানি সংগ্রহের পথ আটকিয়ে রাখে- যাতে তাঁরা পানি পান না করতে পারেন।

ইমাম হুসাইনের শর্তাবলী ঃ ইমাম হুসাইন (রা) অবরোধে থাকা অবস্থায় ইবনে যিয়াদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন ঃ

ক. তাঁকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক, অথবা
খ. তুর্কী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক, অথবা
গ. ইয়াযিদের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য দামেস্কে যেতে পথ ছেড়ে দেয়া হোক।

এসব প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় অবশেষে কারবালার প্রান্তরে ৬০ হিঃ ১০ মুহাররম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পর পর হুসাইনের ভাই উবাইদুল্লাহ, জাফর, উসমান, মুহাম্মদ এবং ছেলে আকবর, কাসেমসহ অনেকেই শহীদ হলেন। মুসলিম সৈন্য শিবিরে স্বজনদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে লাগল। ইমাম হুসাইন স্বয়ং যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে শহীদ করে সীমার। জিলজওশনের নেতৃত্বে ছয় ব্যক্তি একত্রে আক্রমণ করে। এভাবে শেষ হয়ে যায় নবী বংশের শেষ চিহ্ন।

ফলাফল

ইসলামি ঐক্যে কুঠারাঘাত ঃ এ মর্মান্তিক ঘটনার পর ইসলামি ঐক্যে ফাটল ধরে- যা জাতীয় জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং পুনরায় ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ দানা বেঁধে ওঠে।

খিলাফতের ধারা পরিবর্তন ঃ কারবালার ঘটনার ফলে খিলাফতের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। ঐক্য, সংহতি ও ইসলামি বিধান সম্বলিত খিলাফত চলতে থাকে অযোগ্য, অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীদের মনগড়া আইনে।

রাজনৈতিক বিপর্যয় ঃ কারবালার হত্যাকাণ্ড ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য একটি রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। এ ঘটনা সর্বপ্রথম উমাইয়া বংশের সর্বনাশ এবং খিলাফতের পর অনেক রাষ্ট্রে বিপদ সৃষ্টি করে।

শিয়া মতবাদের জন্ম ঃ কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ডের ফলে আলী (রা)-এর বংশের অনুকূলে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠে। এ মতের সমর্থকরা মনে করেন, খিলাফতের একমাত্র অধিকারী হলেন আলী ও ফাতিমা (রা)-এর বংশধর। এর পর থেকে এ দল 'শিয়া' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তারা আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আরোহণ করাতে অনেক সাহায্য করেছিল।

ইয়াযীদ বাহিনীর মক্কা ও মদীনা আক্রমণ ঃ ইয়াযিদ বাহিনীর নির্মম কর্মকাণ্ড ও অসততায় ক্ষুব্ধ হয়ে মক্কা ও মদীনাবাসী ইয়াযীদের পদত্যাগ ঘোষণা করে ইয়াযিদ কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করেন। এতে ইয়াযীদ রাগান্বিত হয়ে মুসলিম নামে এক দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে মদীনায় পাঠিয়ে অনেক লোক হত্যা করল। তিনদিন ব্যাপী সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ মদীনাকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। অতঃপর মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মুসলিম মক্কায় ইবনে যুবাইরের বাধার সম্মুখীন হন। বাধা পেয়ে তারা মক্কা নগরী অবরোধ করে রাখেন। এ প্রসঙ্গে হিট্টি বলেন, "অবরোধকালে কা'বাঘরে অগ্নি সংযোজিত হয় এবং তা ক্রন্দনরতা রমণীর ভগ্ন হৃদয়ের রূপ লাভ করে।" এমন সময় ইয়াযীদের মৃত্যুর খবর পৌঁছলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

সার-সংক্ষেপ

কারবালার হত্যাকাণ্ড ইয়াযীদের রাজত্বকালকে চিরকালের জন্য পৃথিবীতে কলংকিত করে রেখেছে। রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করে অযোগ্য শাসকের এহেন ন্যাক্কারজনক হৃদয়স্পর্শী ঘটনার সূচনায় ইসলামেরই ক্ষতি হয়নি, বরং বিশ্ব ইতিহাসে খারাপ নজীর স্থাপিত হয়েছে। সত্য, ন্যায় ও গণতন্ত্রের জন্য কারবালা প্রান্তরে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত এবং হুসাইন পরিবারের ত্যাগ সকলের কাছে সব সময়ের জন্য শিক্ষার উৎস হয়ে প্রেরণা যোগাত। বহু বাধা-বিপত্তি হুমকি ও প্রাণ বিসর্জন দিয়েও ইমান হুসাইন তাঁর আদর্শ ও নীতি থেকে বিচ্যুত হননি। অবৈধভাবে মনোনীত অযোগ্য ইয়াযিদকে মেনে নেননি। সত্যের জন্য তাঁর এই অবিচল অটল ভূমিকা এবং আত্মত্যাগ সকলের জন্য এক মহান আদর্শ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৫

এক কথায় উত্তর দিন-

১. ইয়াযীদ কে ছিলেন?
২. ইয়াযীদের সাড়ে তিন বছরের শাসনকাল তিনটি ঐতিহাসিক দুষ্টকর্মের জন্য কুখ্যাত। এগুলো কি কি?
৩. ইয়াযীদ কিভাবে ক্ষমতার মসনদে আসেন?
৪. ইয়াযীদ ও হুসাইন (রা)-এর সাথে দ্বন্দ্ব বেঁধে ছিল কেন?
৫. কারবালা কি?
৬. কারবালা কেন বিখ্যাত?
৭. কুফাবাসীরা কার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে? কি ভাবে?
৮. কারবালার ঘটনার পর কোন মতবাদের জন্ম হয়?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইয়াযীদ কে ছিলেন? তাঁর প্রাথমিক জীবন ও চরিত্রের বর্ণনা দিন।
২. ইয়াযীদের ক্ষমতা লাভের বিবরণ দিন।
৩. ইয়াযীদ ও ইমাম হুসাইন (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ চিহ্নিত করুন।
৪. কারবালার ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখুন।
৫. কারবালার ঘটনার ফলাফল কি হয়েছিল তার মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৬ আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) : উমাইয়া শাসন দৃঢ়করণ ও প্রশাসনিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবদুল মালিকের পরিচয় ও ক্ষমতাগ্রহণ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- উমাইয়া শাসন দৃঢ়ীকরণে আবদুল মালিকের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন
- আবদুল মালিকের শাসননীতি ও সংস্কারের বিবরণ দিতে পারবেন
- আবদুল মালিকের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

পরিচয়

আবদুল মালিক ছিলেন হযরত উসমানের প্রধান উপদেষ্টা মারওয়ানের পুত্র। তিনি উসমানের খিলাফত যুগে ২৩ হিজরিতে মদীনায় জন্মলাভ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন ও শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এবং সংকল্প ও সাহসে তিনি অনন্য ছিলেন।

ক্ষমতা লাভের প্রেক্ষাপট

ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে উত্তরাধিকার সূত্রে খলিফা হয়েছিলেন। তিনি মাত্র তিন মাস দেশ শাসন করেছিলেন। দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ছিলেন নিঃসন্তান এবং মুয়াবিয়া বংশের শেষ খলিফা। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন তাঁর ভাতিজা খালিদ। কিন্তু খালিদ ছিলেন অল্প বয়স্ক বালক। তাই সভাসদগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ও দক্ষ মারওয়ান ইবনে হাকামকে খলিফা পদে মনোনীত করেন। মারওয়ানের কাছে শর্ত ছিল খালিদ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবেন তখন খালিদকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে হবে।

মারওয়ান ছিলেন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) প্রধান উপদেষ্টা, সুচতুর রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ। তিনি সিংহাসনে বসেই খালিদের বিধবা মাতাকে বিয়ে করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে খালিদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে নিজ পুত্র আবদুল মালিককে খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দান করেছিলেন। এতে খালিদের মাতা ক্রোধান্বিত হয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় মারওয়ানকে হত্যা করেন। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন তিনি প্লেগ রোগে মারা গিয়েছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ ঃ উমাইয়া বংশের চতুর্থ খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকামের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল মালিক ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে পঞ্চম খলিফা হিসেবে দামেস্কের সিংহাসনে বসেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি (Father of Kings) বা রাজ-পিতা নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, আব্দুল মালিক এবং তাঁর উত্তরাধিকারী চার পুত্রের শাসনকালে দামেস্কের এই রাজবংশ শৌর্য-বীর্য ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে। এ উমাইয়া শাসক ছিলেন কর্মে উৎসাহী, ষড়যন্ত্রে সিদ্ধ হস্ত এবং ধর্মভয়-বিবর্জিত। স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য তিনি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ২০ বছরের খিলাফত কালে তাঁর কৃতিত্ব ছিলো ত্রিমুখি। যথা-

১. বিদ্রোহ দমন ও রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।
২. সামরিক অভিযান ও হৃতরাজ্য পুনর্দখলকরণ।
৩. শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও উমাইয়া প্রভুত্বকে সুদৃঢ়ীকরণ।

বাধা বিপত্তি

ক্ষমতা লাভের পরই আবদুল মালিককে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুখতার আল সকাকি কুফায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন।

খালিদ-বিন ইয়াযিদ ও আমর বিন সাঈদ দামেস্কের সিংহাসন দখলের জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) মক্কায় নিজেকে স্বাধীন খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খারিজীরা দেশের অভ্যন্তরে অরাজকতা সৃষ্টি করে উমাইয়া বংশের সিংহাসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলেন।

গোত্রকলহ উমাইয়া শাসনের সর্বনাশ সাধন করেছিল।

সুযোগ বুঝে রোমানগণও মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত হানা দিতে আরম্ভ করে।

এ সকল বাধ-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও খলিফা আবদুল মালিক অসীম সাহস ও অসাধারণ দক্ষতার সাথে অবস্থার মোকাবেলা করেন। তিনি দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। অবশেষে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, সাথে সাথে উমাইয়া বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

মুখতারের বিদ্রোহ

মুখতার ছিলেন হযরত উমরের খিলাফতকালে সেতুর যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত সাকীফ গোত্রের আবু উবাইদার পুত্র। তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। আবদুল মালিকের খিলাফতকালে তিনি কারবালা হত্যাকাণ্ডের একজন প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে আবির্ভূত হন এবং ইরাক, পারস্য ও হিজাজের বিভিন্ন এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তার করে দীর্ঘদিন যাবত উমাইয়া বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

প্রথম হতেই তিনি হিজাজের আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে মিত্রতা স্থাপনে সচেষ্ট হন। কিন্তু অস্থির মস্তিস্ক ও ধূর্ত স্বভাবের জন্য আব্দুল্লাহ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তবুও ইয়াযীদ কর্তৃক মক্কা অবরোধকালে তিনি আবদুল্লাহকে সহায়তা করেন। ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কারবালা হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে কুফায় উপস্থিত হন। এ স্থানে বহু 'অনুশোচনাকারী' তাঁর দলে যোগদান করে। তার কার্যকলাপে সন্দিহান হয়ে আবদুল্লাহর নিযুক্ত কুফার শাসনকর্তা তাকে বন্দী করেন। অবশ্য কিছু দিন পরে মুক্তিলাভ করে কুফার শাসনকর্তাকেই বিতাড়িত করে তিনি সেখানে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে ক্রমে ইরাক, পারস্য ও হিজাজের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি নিজকে হযরত আলীর পুত্র মুহাম্মদ আল হানাফিয়ার প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। ইব্রাহীম ইবনুল আশতারকেও তিনি কৌশলে নিজ দলভুক্ত করতে সক্ষম হন।

স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে মুখতার সাকাফী কারবালার হত্যাকাণ্ডের নায়ক উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যদল গঠন করেন। এ সময় কুফায় মুখতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে মুখতার ইবরাহীম ইবনুল আশতারকে ডেকে পাঠান। কুফার রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষ ঘটে। ক্ষিপ্রতার সাথে এ বিদ্রোহ দমিত হয়। এ সময় কারবালা হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক সীমার, আমর ইবনে সা'দসহ প্রায় ৩০০ বিদ্রোহী নিহত হয়। বাকী সকলে বসরায় পলায়ন করে।

৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে আবদুল মালিক মুখতারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জাব নদীর তীরে উভয় পক্ষের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদসহ বহু সিরীয় সৈন্য নিহত হয়। মুখতার জয়লাভ করেন। ইবরাহীম আল আশতার নিহত উবাইদুল্লাহর খণ্ডিত মস্তক মুখতারের নিকট কুফায় প্রেরণ করেন। এভাবে মুখতার কারবালা হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ককে হত্যা করে ইমাম হুসাইনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন।

ইরাক অঞ্চলে মুখতারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর শংকিত হয়ে উঠেন। মুখতার আবদুল্লাহর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে ইচ্ছুক হলেও আবদুল্লাহ তাঁর ধূর্ততায় আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় বিচলিত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাঁর ভ্রাতা মাসয়াবকে মুখতারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মাসয়াব বিখ্যাত যোদ্ধা মুহাল্লাবসহ মুখতারের সম্মুখীন হন। মুখতার পরাজিত হয়ে ৮০০০ সৈন্যসহ একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলে মাসয়াব কর্তৃক সেখানে অবরুদ্ধ হন। এর অবস্থায় খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বহু অনুচরসহ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত হন। কুফা আবদুল্লাহর হস্তগত হয়। এভাবে আবদুল মালিকের এক শত্রু মাসয়াবের হাতে, অপর শত্রুতা মুখতারের হাতে পতন ঘটে। মুখতারের এ অভিযানে সত্তর হাজার লোক নিহত হয়।

তাওয়াবীন (অনুশোচনাকারীগণ)-এর দমন

মারওয়ান মৃত্যুর পূর্বে ইবনে যিয়াদকে ইরাকের উপর আক্রমণ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এদিকে কুফায় তাওয়াবীন নামে একটি দল সৃষ্টি হল। এরাই ইমাম হুসাইন (রা)-এর সাহায্য করবে বলে আনুগত্য প্রদর্শন করে পরে ইমামের সাথে প্রতারণা করেছিল। হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতে তারা অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। তারা এর প্রায়শ্চিত্ত এভাবে করতে চেয়েছিল যে, হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদেরকে বেছে বেছে হত্যা করতে হবে। তাই তারা সোলায়মান ইবনে সাদ-এর নেতৃত্বে নিজেদের কাজ শুরু করে এবং হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের হত্যা করতে আরম্ভ করে। ইবনে যুবাইরের আমলে তাদেরকে বাঁধা দেয়া হয়নি। পরিশেষে এ দলের মোকাবেলা ইবনে যিয়াদের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং দলটি পরাস্ত হয়।

আমরের বিদ্রোহ দমন

আবদুল মালিক যখন খিলাফত লাভ করেন তখন মারওয়ানের চাচাত ভাই আমর ইবনে সা'দ মনে করেছিলেন তিনিই খলিফা হবেন। কিন্তু খিলাফত লাভে ব্যর্থ হয়ে দামেস্কের শাসনকর্তার পদে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে তিনি আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পর তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু পরিশেষে ভবিষ্যতের বিপদ এড়াবার জন্য তাঁকে সুকৌশলে দরবারে ডেকে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

মাসয়াবের বিরুদ্ধে অভিযান

সিরিয়ায় আমরের বিদ্রোহ দমন করে আবদুল মালিক মাসয়াবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। প্রলোভন, ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদির সাহায্যে আবদুল মালিক কুফাবাসীদের অনেককে নিজ দলে ভিড়াতে সক্ষম হন। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মালিক স্বয়ং মাসয়াবের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে মুসয়ব মাসয়াবের পুত্র ইয়াহইয়া ও সেনাপতি ইবরাহীম ইবনুল আশতার পরাজিত ও নিহত হন। মাসয়াবের ছিন্ন মস্তক দামেস্কে প্রেরিত হয়। মাসয়াবের পরাজয়ের ফলে ইরাকে পুনরায় উমাইয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সংঘর্ষ

মুখতার ও মাসয়াবের পতনের পর আবদুল্লাহ মালিক তার প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে দমন করার জন্য তৎপর হলেন। ইতোমধ্যে আবদুল্লাহ মালিক মক্কা ও মদীনার পবিত্র ভূমি নিজ খিলাফতে অন্তর্ভুক্ত করার মানসে ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নেতৃত্বে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ইবনে যুবায়ের আবদুল মালিকের আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করলে হাজ্জাজ মক্কা অবরোধ করেন। দীর্ঘ সাত মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর মক্কাবাসীগণ নিদারুণ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হন। এর ফলে আবদুল্লাহর অনুচরদের মধ্যে অনেকেই দলত্যাগ করতে থাকে। এ অবস্থায় তাঁর মা ন্যায়ের পক্ষে অবিচল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে উমাইয়াদের গোলামীর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ। এতে মানসিক শক্তি ফিরে পান আবদুল্লাহ। নতুন উদ্দম নিয়ে আবার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে আরাফাতের যুদ্ধে আবদুল্লাহ হাজ্জাজের বাহিনীর মোকাবিলা করেন। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে তাঁর ছিন্ন মস্তক প্রথমে মদীনায় ও পরে দামেস্কে প্রদর্শিত হয়। অতপর নিষ্ঠুর হাজ্জাজ তাঁর মস্তককে লাঞ্ছিত করে শূলবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর মাতার নিকট প্রেরণ করেন। ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে নয় বছরকাল হিজাজ প্রদেশে খিলাফত পরিচালনার পর ৭২ বছর বয়সে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) শাহাদত বরণ করেন। সুন্নী সম্প্রদায় তাঁকে ন্যায়সঙ্গত খলিফা বলে মনে করে থাকেন। পবিত্র মক্কা ও মদীনাতে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নামে খুতবাহ পাঠ হত। তাঁর মৃত্যুতে আবদুল মালিক মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে স্বীকৃত হলেন। এরপর আবদুল মালিক খোরাসানে আবদুল্লাহর বিশ্বস্ত গভর্নর ইবনে খাজিমকে পরাজিত করে খোরাসানকে উমাইয়া খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। আবদুল্লাহর পতনের পর তাঁর সহকারী মুহাল্লিব ইবনে আবি সুফরাহ নিরূপায় অবস্থায় আবদুল মালিকের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

খারিজী দমন

আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত থাকায় আবদুল মালিক খারিজীদের দমন করতে সক্ষম হননি। খিলাফতের দাবীদারগণকে দমন করে খলিফা এবার খারিজী দমনে তৎপর হন। হাজ্জাজ ও মুহাল্লিবের প্রচেষ্টায় খারিজীরা দমিত হয়। খারেজীদের নেতা শাবীব ও অন্যান্য নেতা নিহত হয় এবং খারিজী উৎপাত হতে ইরাক ও ইরানের বহু অঞ্চল রক্ষা পায়।

রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান

খারিজী দমনে ব্যস্ত থাকায় ইতোমধ্যে রোমানরা মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর হামলা চালায়। রোম সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান আবদুল মালিকের প্রেরিত সেনাবাহিনীর হামলায় পরাজিত হন এবং দক্ষিণ আর্মেনিয়া খলিফার কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য হন। পূর্বদিকে কাবুলের নিকটে হিন্দু রাজা জানবিলও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

সেনাপতি ওকবা সর্বপ্রথম উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। ওকবা ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে কায়রোয়ান শহর স্থাপন করেন। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা এ শহর জয় করে নেয়। পুনরায় যুবাইয়ের নেতৃত্বে আরবীয় বাহিনী কায়রোয়ান দখল করে নেয়। রোমানিয়া তা পুনরাধিকার করে ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে। মুসলিম সেনাপতি হাসান বিন নোমান ৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে শেষ বারের

মত শহরটি হস্তগত করেন। হাসান কার্থেজ পর্যন্ত দখল করেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে জন দি পেট্রিনিয়ান আবার তা দখল করে নেয়। শেষ পর্যন্ত মুসা বিন নুসায়ের চিরদিনের মত কার্থেজ ও আফ্রিকার উপকূল হতে রোমানদেরকে বিতাড়িত করেন।

গোড়ার দিকে যখন বার্বার বাহিনীর হামলায় সেনাপতি যুবায়ের বার্কায় নিহত হন, তখন হতে হাসান বিন নোমান আফ্রিকায় যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মিলিত বার্বার ও রোমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃত হয় বার্কা হতে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত। ইতোমধ্যে বার্বার রাণী বাহিনীর অভ্যুদয়ের ফলে বার্বার হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে হাসান বিন নোমান বার্কায় পাঁচ বছর নিষ্ক্রিয় থাকেন। অতপর খলিফার প্রেরিত বৃহত্তর সেনাবাহিনীর সাহায্যে রাণী বাহিনী পরাজিত ও নিহত হয়। বার্বারগণ অনন্যোপায় হয়ে মুসলিম খলিফাকে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) অশ্বারাহী সৈন্য সরবরাহ করার শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। বার্বার ভূমি আফ্রিকায় মুসলিম পতাকা এবার নিরুপদ্রুবে উড্ডীন হয়।

জানবীলের বিরুদ্ধে অভিযান

সিজিস্তানের রাজা জানবীল কাবুল হতে কান্দাহার পর্যন্ত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করছিলেন। আবদুল মালিক নিযুক্ত ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করলে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আল আসাস নামক সেনাপতির অধীনে কুফা ও বসরার অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত 'ময়ুর বাহিনী' নামে পরিচিত একটি বিশাল বাহিনী জানবীলের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। জানবীল পরাজিত ও বিতাড়িত হয় এবং মুসলিম বাহিনী হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে।

ইবনুল আসাথ-এর বিদ্রোহ

জানবীলকে পরাজিত করার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ময়ুর বাহিনীর নেতা ইবনুল আসাথকে শত্রু বাহিনীর উপর অত্যাচার করার আদেশ প্রদান করেন। ইবনুল আসাথ এটা অমান্য করে ইরাকের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। খলিফা তার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করলে ময়ুর বাহিনীর নিকট তারা পরাজিত হয়। অতপর হাজ্জাজ সিরীয় বাহিনীর সহায়তায় ময়ুর বাহিনীকে পরাজিত করে বসরায় প্রায় এগার হাজার লোককে হত্যা করেন। এতে দলে দলে লোক ময়ুর বাহিনীতে যোগদান করে এবং তাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষে দাঁড়ায়। খলিফা আবদুল মালিক ইবনুল আসাসের সঙ্গে বিবাদ মিটাবার জন্য হাজ্জাজকে অপসারণ, ইরাকীদের ভাতা বৃদ্ধি, ইবনুল আসাথকে উচ্চ পদে নিয়োগ ইত্যাদি প্রস্তাব করলে তিনি উক্ত প্রস্তাবে রাজী হলেন, কিন্তু সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। ফলে আবদুল মালিক হাজ্জাজের সাহায্যার্থে একদল সিরীয় বাহিনী প্রেরণ করলেন। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ৭০১ খ্রিস্টাব্দে ইবনুল আসাথ পরাজিত হয়ে সিজিস্তানে পলায়ন করেন। পরে তিনি ধৃত ও নিহত হন। অধিকাংশ বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করে। এভাবে ইবনুল আসাথের মৃত্যুতে উমাইয়া খিলাফতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং কুফা ও বসরায় উমাইয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবদুল মালিকের শাসন সংস্কার

বিশ্ব রাজন্যবর্গের তালিকায় আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। ক্ষমতায় আরোহণ করে তিনি যে শাসনতান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন তাতে ইসলামি সাম্রাজ্য নতুন গতি লাভ করে। সাম্রাজ্য একত্রীকরণ, সম্প্রসারণ ও শাসন সংস্কার কার্যে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর রণকৌশল শাসন সৌকর্য সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। স্পুলারের মতে, আবদুল মালিকের শাসনামলে ইসলামের ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ ছিল। মূলত আবদুল মালিক উমাইয়া শাসনকে দৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করতে নানা ধরনের প্রশংসনীয় সংস্কার সাধনকারী হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। তার সংস্কার সমূহের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপ -

শাসন ব্যবস্থায় আরবিকরণ ঃ মহানবী (স)-এর আমলে ইসলামি রাষ্ট্র শুধুমাত্র আরব ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল বিধায় সরকারী কাগজপত্র আরবি ভাষায় রক্ষিত হত। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে পারস্য, সিরিয়া, মিশর, প্রভৃতি স্থানে ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তৃত হওয়ায় সে সব এলাকায় আঞ্চলিক ভাষায় দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পন্ন হত। আবদুল মালিক রাষ্ট্রকে জাতীয়করণের এবং সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেন। ফলে আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে অফিস আদালতে দলিল পত্রাদি আরবি ভাষায় হওয়ার নিয়ম চালু হয়।

আরবি বর্ণলিপির উন্নতি সাধন ঃ আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের পাশাপাশি আরবি লিপির সংস্কার তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ যাবত আরবি বর্ণমালায় কোন নোকতার ব্যবস্থা না থাকায় নানা অসুবিধা হতো, বিশেষত অনারব মুসলমানরা তা পড়তে, লিখতে সমস্যার সম্মুখীন হতো। আবদুল মালিক হাজ্জাজের সহযোগিতায় আরবি লিপিতে নোকতা সংযোজন করে আরবি ভাষা সহজে পঠন ও পাঠনের সুব্যবস্থা করেন।

আরবি মুদ্রার প্রচলন ঃ এ যাবত ইসলামি রাষ্ট্রে কোন কেন্দ্রীয় টাকশাল ও অভিন্ন মুদ্রার প্রচলিত ছিল না বিধায় বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মুদ্রার চালু ছিল। যার ফলে নানা সমস্যা দেখা দিত। এ সব অসুবিধা দূর করার জন্য আবদুল মালিক (৬৯৬ সালে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল স্থাপন করে) আরবি অক্ষর যুক্ত দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিরহাম (রৌপ্য) ও ফালুস (তাম্র) নামের আরবি মুদ্রা চালু করে রাজ কাজে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

ডাক বিভাগের সংস্কার ঃ আবদুল মালিকের খিলাফত কালে ডাক বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় রাজধানী দামেস্ক হতে প্রাদেশিক রাজধানী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে দ্রুত ডাক পরিবহনের ব্যবস্থা করেন।

এসব ঘোড়ার গাড়ি কখনো সৈন্যদের যাতায়াতের জন্যও ব্যবহৃত হতো। তা ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের পোস্ট মাস্টারগণ গোয়েন্দা বিভাগের লোক হিসেবে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ খবরাদি 'সাহিব উল বারীদ' বা কেন্দ্রীয় পোস্ট মাস্টার জেনারেলের নিকট পাঠাত।

রাজস্ব সংস্কার

খলিফা মালিকের আমলে নানা সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য অগণিত অমুসলিম অনারব ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। একদিকে ধনীরা যাকাত ছাড়া অন্যান্য কর দিত না, অপরদিকে হাজার হাজার গ্রামবাসী শহরে এসে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে নিয়মিত ভাতা পেতে শুরু করে।
এতে প্রথমত তাদেরকে খারাজ বা জিযিয়া দিতে হত না, দ্বিতীয়ত সেনাবাহিনীতে যোগ দানের ফলে তারা বাড়তি সুবিধা পেত।
খলিফা হাজ্জাজের পরামর্শে তাদেরকে স্বীয় গ্রামে বসবাসে বাধ্য করে খারাজ (ভূমিকর) প্রদানের নিয়ম প্রচলন করেন। এছাড়া আরব মুসলমানগণ কর্তৃক অনারবদের জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন।

তিনি অনুর্বর ও পতিত জমি তিন বছর মেয়াদে কৃষকদের মাঝে বিনা রাজস্বে বিতরণ করে কৃষিকাজের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এভাবে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করে উমাইয়া খিলাফতকে সমূহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করেন।

স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক

আবদুল মালিক একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পানুরাগী ছিলেন। মহানবী (স) মদীনা হতে জেরুজালেম এসে যে পাথর খণ্ডের উপর পা রেখে মি'রাজে গমন করেন সেখানে ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে আটকোণা বিশিষ্ট 'কুব্বাতুস সাখরা' বা বিরাট পাথরের গম্বুজ স্মৃতি সৌধ (The dome of the Rock) নির্মাণ করেন। এরই পাশে দক্ষিণ দিকে 'মসজিদ-উল-আকসা' নামে মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি দামেস্কে মুহাফিজখানা বা সরকারি দলিল দস্তাবেজখানা (দিওয়ান উর রাসাইল) স্থাপন করেন।

আব্দুল মালিকের মৃত্যু

২০ বছর রাজত্ব করার পর ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মালিক ৬২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র আল ওয়ালিদকে সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

সার-সংক্ষেপ

আব্দুল মালিক ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় এবং শ্রেষ্ঠতম উমাইয়া শাসকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, প্রজ্ঞাবান কূটনীতিক, বিচক্ষণ শাসক। তাঁর রাজদরবারে কবি সাহিত্যিক জ্ঞানী গুণীগণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সার্বিক বিচারে তিনি ছিলেন একজন সার্থক ও সফল শাসক। উমাইয়া বংশের চতুর্থ খলিফা পিতা মারওয়ান ইবনুল হাকামের মৃত্যুর পর আবদুল মালিক উমাইয়া বংশের পঞ্চম খলিফা হিসেবে দামেশকের সিংহাসনে বসেন। খলিফা আব্দুল মালিক স্বীয় কর্মদক্ষতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও অতুলনীয় চরিত্র গুণে উমাইয়া বংশকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে একে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসামান্য। তিনি কুরআনে হাফিজ ছিলেন, অসংখ্য হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। কোন-কোন ঐতিহাসিক তাঁর চরিত্রে লোভ ও নিষ্ঠুরতার কথা বললেও আসলে তিনি তেমনটি ছিলেন না। তিনি জনকল্যাণ মূলক বহুবিধ সংসারে সাধান করে ইতিহাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। বলা হয় মুয়াবিয়া ছিলেন উমাইয়া খিলাফত প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আর খলিফা আব্দুল মালিক ছিলেন উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৬

এক কথায় উত্তর দিন-

১. খলিফা আব্দুল মালিকের পরিচয় দিন।
২. তিনি কত বছর রাজত্ব করেন এবং তাঁর কৃতিত্বের দিক গুলো কি কি?
৩. মুখতারের বিদ্রোহ কেমন ছিল?
৪. তাওয়াবীন বা অনুশোচনাকারী ছিল কারা?
৫. মুসয়াব কে ছিলেন?
৬. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর কে ছিলেন?
৭. মূসা বিন নুসায়ের কে ছিলেন? তিনি কাদেরকে কোথা হতে বিতাড়িত করেন?
৮. জানবীল কে ছিলেন?
৯. ইবনুল আসাথ কে ছিলেন? তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন কেন?
১০. তাঁর শাসন সংসারের মধ্যে আরবিকরণ বলতে কি বোঝেন?
১২. আবদুল মালিক রাজস্ব ব্যবস্থায় কি সংস্কার করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আব্দুল মালিক কে ছিলেন? তাঁর ক্ষমতা লাভের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
২. ক্ষমতা লাভের পর তিনি কি কি বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হন?
৩. মুখতার কে? তাঁর বিদ্রোহের বিষয়ে যা জানেন লিখুন।
৪. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের সাথে তাঁর সংঘর্ষের বর্ণনা দিন।
৫. আবদুল মালিকের উল্লেখযোগ্য শাসন সংস্কারের একটি বিবরণ দিন।

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) এর বিজয়াভিযান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ওয়ালিদের পরিচয় ও ক্ষমতারোহন ও প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে ওয়ালিদের বিজয়াভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।

পরিচয় ও ক্ষমতাগ্রহণ প্রাথমিক কার্যাবলী

খলিফা ওয়ালিদ ছিলেন খলিফা আবদুল মালিকের বড় ছেলে। পিতা তাঁকে পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন করে যান পিতার মৃত্যুর পর ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালিদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ৫০ হিজরিতে জন্মলাভ করেন। শিক্ষা লাভের তেমন সুযোগ পাননি। নির্ভেজাল আরব শাসক এই বাদশাহ শুদ্ধ আরবি পর্যন্ত বলতে পারতেন না। তবে শাসনের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে দক্ষ ছিলেন।

তাঁর ১০ বছরের শাসনকাল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। পিতা আবদুল মালিক তাঁর শাসন কালে সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে গিয়েছিলেন। এ কারণে ওয়ালিদ নির্বিঘ্নে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ লাভ করেন। ওয়ালিদ শাসন কার্য পরিচালনায় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। পিতার আদেশে তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের শাসনকর্তার পদে বহাল রাখেন। তবে অপরাপর অঞ্চলের কোন কোন শাসনকর্তা পদে পরিবর্তন এনে ছিলেন। তিনি তাঁর চাচাত ভাই উমর ইবন আব্দুল আযীয কে হিজাযের গভর্নর নিযুক্ত করেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর হিজাজের আইনজ্ঞ, পণ্ডিত ও প্রবীণ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

ইয়াযীদ ও আবদুল মালিকের সময় পবিত্র মক্কা ও মদীনার যে ধ্বংস সাধিত হয় সে কালিমা দূর করার জন্য উমর ইবনে আবদুল আযীয শহর দুটোকে সুন্দর সুশোভিত করেন। তিনি উভয় শহরে অনেক প্রাসাদ, পয়ঃ প্রণালী ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। তিনি মদীনার মসজিদে নব্বীর সম্প্রসারণ ও কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ করেন। তাঁর উদার ও কল্যাণকর শাসনে সকল স্তরের জনসাধারণ তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। উমরের শাসনে আকৃষ্ট হয়ে বহু সংখ্যক ইরাকী হাজ্জাজের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য হিজাজে পালিয়ে আসেন। এতে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে খলিফা ওয়ালিদের কাছে অভিযোগ করেন। এতে খলিফা ওয়ালিদ অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হয়ে উমর ইবনে আবদুল আযীযকে হিজাজের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করেন। পরে হাজ্জাজের ইচ্ছানুসারে মক্কা ও মদীনায় দু'জন পৃথক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। উমরের বিদায়ে মক্কা-মদীনার আবাল বৃদ্ধ, বনিতা শোকাহত হন। খোরাসানের শাসনকর্তা ইয়াযীদ বিন মহাল্লিবের সাথে প্রথমে হাজ্জাজের ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পরে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং খলিফা ওয়ালিদকে দিয়ে তাঁর অপসারণ ঘটানো হয়। সেখানে ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জাজের ইচ্ছায় কুতাইবা বিন মুসলিমকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এরপর ওয়ালিদ রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দেন।

ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তার

খলিফা ওয়ালিদের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর রাজত্বকাল দেশ-বিদেশে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ওয়ালিদ ছিলেন তেজোদীপ্ত যুবক ও অপরিমেয় তারুণ্যের অধিকারী। সৌভাগ্যক্রমে তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিম কুতাইবা বিন মুসলিম, মূসা বিন নুসাইর, তারিক বিন যিয়াদ এবং মাসলামা বিন আবদুল মালিকের মত বড় বড় দিগ্বিজয়ী বীর সেনানী লাভ করেছিলেন যারা ঘোড়ার পিঠে বসে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মাঠ-ঘাট, প্রান্তর পদদলিত করে ইসলামি শাসনের নিয়ন্ত্রণে এনে দেন। তাঁর সময়ে মুসলিম বাহিনী দিগ্বিজয়ের এক নতুন প্রেরণায় উদ্বেলিত হয়ে ইসলামি সাম্রাজ্যকে আমু দরিয়া থেকে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত করে। উইলিয়াম মুইর বলেন, "এমনকি, উমরের শাসনামল বাদ না দিলেও এমন কোন আমল ছিল না যখন ইসলাম বিদেশে এতটা সম্প্রসারিত ও সংহতি হয়েছিল।"

মধ্য এশিয়া বিজয়

ইসলামের ইতিহাসে রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়ে প্রথম ওয়ালিদের শাসনকাল বিখ্যাত। এ শাসনামলে পূর্বে ও পশ্চিমে বহু সংখ্যক বিজয় অর্জিত হয়। পূর্বদিকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্দেশে মধ্য এশিয়া ও সিন্ধু বিজিত হয়।

তুর্কীদের বাসভূমি ট্রান্স অক্সিয়ানায় বহু ছোট বড় রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে বলখ, তুখারিস্তান, বোখারা, ফরগানা ও খারিজম রাজ্য উল্লেখযোগ্য। তুর্কীরা বিদ্রোহ করে সর্বদা মুসলমানদের অসুবিধা সৃষ্টি করত। এ অসুবিধার জন্য হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাবকে সেখানকার শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করে কুতাইবা ইবনে মুসলিমকে নিযুক্ত করেন। কুতাইবা এ কর্তব্য পালনে যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি সমগ্র মধ্য এশিয়াকে মুসলিম শাসন বলয়ের মধ্যে আনয়ন করেন। উল্লেখ্য যে, রাশিয়ায় কমুনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হবার পর কমুনিস্টরা তুর্কীস্তানের প্রায় অর্ধ ডজন মুসলিম রাজ্য দখল করে নেয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ঐ সকল এলাকা এবং রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বর্তমানে ৫ কোটির অধিক মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। সোভিয়েত আমলে রাশিয়ার খনিজদ্রব্যসহ অনেক মূল্যবান সম্পদ মুসলিম এলাকাগুলোতেই উৎপাদিত হয়।

মধ্য এশিয়ায় কুতাইবার অভিযান

কুতাইবা প্রথমে (৭০৬ খ্রি) বলখ ও তুখারিস্তানের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানকার শাসকগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে খলিফাকে কর দিতে স্বীকৃত হয়। অতঃপর তিনি বোখারা আক্রমণ করে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তা দখল করেন। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি অক্সাস পার হয়ে খারিজমের দিকে অগ্রসর হন। খারিজম শাহ মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোমধ্যে সমরকন্দ মুসলিম শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করায় কুতাইবাকে সেখানে প্রেরণ করা হয়। তিনি সমরকন্দ আক্রমণ করে তা দখল করেন। পরবর্তী দুই-তিন বছর কুতাইবা খোজান্দ শাশ ও ফরগানার অন্যান্য শহর দখল করে চীন সীমান্তে পৌঁছেন। ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীন তুর্কীস্তান আক্রমণ করেন এবং কাশগড় জয় করেন। কিন্তু ওয়ালিদের মৃত্যুর সংবাদ তাঁর বিজয় অভিযানে ছেদ পড়ে। চীনা তুর্কীস্থানের এ মুসলিম এলাকাটি এখন চীনের অধীন।

আফ্রিকা বিজয়

মূসা ইবনে নুসাইর মিসরের দক্ষিণে ভূ-মধ্যসাগরের উপকূল এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। পশ্চিম দুনিয়ায় তিনি গৌরবময় বিজয় অর্জন করেছিলেন। বার্বারগণ তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদেরকে যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলত। তিনি তাদেরকে পরাজিত করে আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত মুসলিম শাসন আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অতপর তিনি ভূ-মধ্যসাগরে গোলযোগ সৃষ্টিকারী রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি স্পেনের উপকূলীয় মিনর্কা, মেজর্কা, ইভকা প্রভৃতি ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলো দখল করেন।

স্পেন বিজয়

খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থান মুসলিম অধিকারে আসে। তাঁর যুগের বিজয়গুলোর মধ্যে স্পেন বিজয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্পেনে চরম দেউলিয়াত্ব প্রকাশ পায়। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এ সময় সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন রাজা রডারিক। তার অত্যাচারে সমগ্র অঞ্চল ছিল জর্জরিত। শতধা বিভক্ত ছিল স্পেনের অধিবাসী। মধ্যবিত্তরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হত। কৃষিজীবীরা করভারে নিপীড়িত ছিল। পক্ষান্তরে উচ্চ ও সুবিধা ভোগী শ্রেণীকে করভার হতে অব্যাহতি দেয়া হত। গোলাম শ্রেণীর বিয়ের স্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল না। মনিবরা তাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন করত। বিশপরা অত্যধিক ক্ষমতা ভোগ করতো। তারা ইহুদীদের বিয়ে ও ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা খর্ব করেছিলেন। এমতাবস্থায় ত্রাণকর্তা হিসেবে মুসলমানরা স্পেন আক্রমণ করে তা জয় করেন।

স্পেন বিজয়ের কারণ

১. জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল ঃ স্পেন রাজ্য তখন রডারিকের শাসনাধীন ছিল। তিনি ভূতপূর্ব রাজা উইটিজাকে হত্যা করে ক্ষমতায় আরোহন করেছিলেন। রাজা উইটিজা কর্তৃক নিযুক্ত সিউটার শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান রাজা রডারিকের অবৈধ শাসনের কবল থেকে মুক্তি কামনা করে খলিফা ওয়ালিদের নিয়োগকৃত আফ্রিকার গভর্নর মূসার কাছ সাহায্য প্রার্থনা করেন।

২. অত্যাচারী শাসক ঃ রডারিক ছিলেন অত্যাচারী শাসক। তিনি স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করে যাকে খুশী তাকে শাস্তি প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তার অত্যাচারে জনগণ অতীষ্ট হয়ে পড়েছিল।

৩. অসৎ স্বভাবের পরিষদ ঃ রডারিক নিজে তো অসৎ স্বভাবের ছিলেন, এমনকি তাকে ঘিরে তার পরিষদ, সভাসদের প্রায় সকল সদস্য ছিলো অসৎ স্বভাবের। ফলে রাজ্য পরিচালনা করতে রডারিক তাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এতে রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। এ সুযোগে মুসলমানরা হামলা চালায়।

৪. ফ্লোরিন্ডার অবমাননা ঃ রাজ দরবারের নিয়ম-কানুন শিক্ষার জন্য কাউন্ট জুলিয়ান তাঁর কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজা রডারিকদের দরবারে প্রেরণ করলে রডারিক তার শ্লীলতাহানি করে। এ অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং রডারিককে তার রাজ্য হতে বিতাড়িত করার জন্য জুলিয়ান ভূ-মধ্যসাগরীয় উপকূলের শাসনকর্তা মুসা বিন নুসাইরকে স্পেন আক্রমণ করতে আহবান করলেন।

যুদ্ধের ঘটনা

মুসা বিন নুসাইর খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে সেনাপতি তারিক-বিন-যিয়াদকে ৭১২ খ্রি স্পেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সেনাপতি তারিক ৭,০০০ সৈন্যসহ স্পেনের মোডনিয়া-সিডোনিয়ার নিকটবর্তী ওয়াডালেট নদীর তীরে রডারিকের মোকাবিলা করেন। এ যুদ্ধে রডারিক পরাজয় বরণ করে এবং পলায়নকালে নদীগর্ভে ডুবে যান। এরপর তারিক একে একে সিডোনিয়া, কারমোনা ও গ্রানাডা জয় করেন। কর্ডোভা জয়ের পর তিনি স্পেনের রাজধানী টলেডো গমন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্পেনের অধিকাংশ এলাকা দখল করেন। অতঃপর মুসাও ৭১২ সালের জুন মাসে স্পেনে গমন করেন এবং খুব দ্রুত সেভিল ও অন্যান্য শহর জয় করেন। মুসা এক পর্যায়ে তারিকের সাথে একত্র হয়ে সার গোসা, টেরাগোনা ও বার্সিলোনা দখল করেন। মুসা আরও অগ্রসর হয়ে সমগ্র ইউরোপ জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদের নিকট থেকে রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ পেয়ে তিনি তা করতে পারলেন না।

স্পেন বিজয়ের ফলাফল

১. নতুন যুগের সূচনা ঃ মুসলিম বাহিনী কর্তৃক স্পেন বিজয়ের ফলে এক নব যুগের সূচনা হয়। অত্যাচারী শাসকের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায়ের শাসন। এতে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

২. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ স্পেন বিজয়ের ফলে সামাজিক অসাম্য পদমর্যাদার বৈষম্য দূরীভূত হয়। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিশাল পার্থক্য কমে সমমর্যাদার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর যে ধরনের করের বোঝা প্রচলিত ছিল এদের জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রেখে করভার হ্রাস করা হয়।

৩. ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান ঃ স্পেন বিজিত হওয়ার পর সেখানে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করার সুযোগ পায়। যে কোন সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নর-নারী অথবা শিশু অবাধে উপাসনা করতে পারত।

৪. কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দান ঃ মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে সেখানে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন এবং জনতাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদান করেন।

৫. শিক্ষা-সংস্কৃতি, কলা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ঃ স্পেন বিজয়ের ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণকে গবেষণা ও অন্যান্য কাজে সুবিধা দেয়া হত। শিক্ষা প্রসারে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানরা খ্যাতি অর্জন করেছিল। কলা ও বিজ্ঞানের বিকাশেও মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল।

মুসলমানগণ স্পেন বিজয় করে এতদঞ্চলে মুসলিম শাসনের ভীত যেভাবে স্থাপন করেছিলেন তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম সেনাপতির লক্ষাধিক সৈন্যের মোকাবিলায় অসীম সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও অনঢ় মনোবলের কারণেই বিজয় ত্বরান্বিত হয়। এ বিজয়ের ফলে সত্যিকার অর্থে স্পেনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের সাফল্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডোজী মন্তব্য করেন, "মুরগণ কর্ডোভায় বিস্ময়কর রাজ্য সংগঠন করে একে মধ্যযুগের বিস্ময়ে পরিণত করেন এবং সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বরোচিত অজ্ঞতা ও কলহে নিমজ্জিত, তখন কর্ডোভা দুনিয়ার সামনে শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল মশাল বহন করে আনে।"

সিন্ধু বিজয়

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরবদের তথা মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষ এবং ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হযরত উমর (রা) এবং হযরত উসমানের (রা) সময় থেকে ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযান প্রেরণের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হলেও মহান উমাইয়া শাসক খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু জয়ের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। সিন্ধু অভিযানের পেছনে বিদ্যমান পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. ভারতবর্ষের প্রতি আরবদের আকর্ষণ ঃ সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা সম্পদশালী ভারতবর্ষের কথা আরবদের অজানা ছিল না। স্বভাবতই এরূপ দেশের প্রতি আরব শাসকদের প্রচণ্ড কৌতুহল ও আকর্ষণ ছিল। আর আকর্ষণ ছিল বলেই সিন্ধু বিজয়ের পটভূমি রচিত হয়েছিল।

২. সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি ঃ উমাইয়া খলিফাগণ বিশেষত খলিফা আল ওয়ালিদ রাজ্য বিস্তার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির বাস্তব ফল ছিল মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু অভিযান।

৩. অর্থনৈতিক কারণ ঃ উমাইয়া সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং চাহিদা পুরণের প্রয়োজনে সিন্ধু অভিযান অত্যাবশ্যকীয় ছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন।

৪. অরক্ষিত সীমান্ত এবং সীমান্ত বিরোধ ঃ বেলুচিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল মেকরান মুসলিম অধিকারে আসলে মুসলিম রাজ্যসীমা রাজা দাহিরের রাজ্যসীমার সন্নিকটবর্তী হয়। ফলে সীমান্ত বিরোধ শুরু হয়।

৫. দাহির কর্তৃক বিদ্রোহীদের আশ্রয় দান ঃ বেশকিছু ইরাকী বিদ্রোহী রাজা দাহিরের আশ্রয় গ্রহণ করলে ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাদের ফেরৎ পাঠাবার দাবি জানান। কিন্তু সিন্ধুরাজ বিদ্রোহীদের ফেরৎ পাঠাতে অস্বীকার করলে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা দাহিরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৬. সিন্ধু জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন ঃ উমাইয়া শাসকের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ সিংহল রাজ প্রেরিত আটটি মূল্যবান উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ দেবল ও মেকরান উপকূলে সিন্ধুর জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হওয়া ছিল সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। হাজ্জাজ উক্ত ঘটনার প্রতিকার দাবি করলে রাজা দাহির তা কৌশলে এড়িয়ে যান। এতে হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে খলিফা আল-ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। উবায়দুল্লাহ এবং বুদায়েলের নেতৃত্বে প্রাথমিক দু'টি অভিযান ব্যর্থ হলে সিন্ধু অভিযানের চূড়ান্ত নেতৃত্ব দান করেন বীর সেনানী মুহাম্মদ বিন কাশিম।

ঘটনা প্রবাহ

মুহাম্মদ বিন কাশিম প্রায় পনের হাজার সৈন্য নিয়ে রায় ও সিরাজ হয়ে মেকরানে উপস্থিত হন। মেকরানের শাসনকর্তা মুহাম্মদ হারুন তাঁকে রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও দুর্গ ধ্বংসের সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেন। এ সময় অত্যাচারিত জাঠ ও মেঠ সম্প্রদায়ের লোকজন কাশিমের সঙ্গে যোগদান করে। মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ সালে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে দেবল বন্দর এবং তৎপর অতি সহজে নিরুন, সিওয়ান ও সিসাম অধিকার করেন।

অতঃপর সিন্ধু নদী অতিক্রম করে মুহাম্মদ বিন কাশিম রাওয়ারের নিকট এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর তার পত্নী রাণী বাঈ এবং পুত্র জয়সিংহ রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে তা রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অবশেষে রানী বাইচ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। রাওয়ার দুর্গ জয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাশিম ব্রাহ্মণাবাদ, আলোর এবং ৭১৩ সালে মুলতান অধিকার করেন। মুলতান বিজিত হলে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু অভিযানের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফলাফল

স্টেনলী লেনপুল আরবদের সিন্ধু বিজয়কে নিষ্ফল উপাখ্যানরূপে বর্ণনা করেছেন। তার এ মতামত রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব সুদূর প্রসারী ছিল না। কারণ আরবদের রাজনৈতিক বিজয় কেবল সিন্ধু ও মুলতানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অর্থনৈতিক ঃ সিন্ধু ও মুলতানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার উপকূলে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সুদূরপ্রসারী হয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় ঃ সামাজিক এবং ধর্মীয় বৈষম্য ও অত্যাচার-অবিচার দূরীভূত হয়। রাজস্ব নীতি ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে ইতপূর্বে যে বৈষম্য ছিল তা তুলে দেয়া হয়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায় সামাজিক মর্যাদা লাভ করে। ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানদের উদার রীতিনীতি, আদর্শ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা স্থানীয় জনগণ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। আর এ জন্যই তারা ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হয়। ফলে এ অঞ্চলে দ্রুত মুসলিম সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে। জনমঙ্গলকর আরব শাসনে সিন্ধু ও মুলতান এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা ও সহাবস্থানের মাধ্যমে নতুন কৃষ্টির উন্মেষ ঘটে।

সাংস্কৃতিক ফলাফল ঃ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। দুটি ভিন্নমুখী ধর্ম ও সভ্যতা একে অপরের সংস্পর্শে আসার ফলে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ হয়। মুসলমানগণ যেমন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-সঙ্গীত, চিত্রকলা, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানার সুযোগ পায় তেমনি ভারতীয়গণও মুসলিম সংস্কৃতি-সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের অবকাশ পায়। আরবীয়গণ ভারতীয় সভ্যতার বহু উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফলকে উপেক্ষা করা যায় না।

ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় এবং তার ফলাফল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও তাৎপর্যবহ। সিন্ধু বিজয় উপাখ্যান বা ফলাফলহীন ছিল না। এর রাজনৈতিক ফলাফল সুদূরপ্রসারী না হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল খুবই তাৎপর্যবহ।

সার-সংক্ষেপ

খলিফা ওয়ালিদ তাঁর পিতা আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর হিজরি ৮৬ অর্থাৎ ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে দামেশকের সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর দশ বছরের শাসনকাল তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁর শাসনামল মুসলিম সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। মৌলিকতার দিক দিয়ে ওয়ালিদের পিতা আবদুল মালিক শ্রেষ্ঠ হলেও তিনি ছিলেন নানা দিক দিয়ে কীর্তিমান। তাঁর শাসন ব্যবস্থা দেশ বিদেশে গৌরব অর্জন করেছিল। ওয়ালিদ শিয়া ও খারিজীদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাঁর শাসনে গোষ্ঠীকলহ দূরীভূত হয়। এই সময় নানা অঞ্চল জয় করা হয়। বোখারা, সমরকন্দ, সিন্ধু, আফ্রিকা ও স্পেন মুসলিম আধিপত্যাধীনে আসে। ওয়ালিদের সাম্রাজ্য চীন সীমান্ত হতে বিস্কে উপসাগর এবং উরাল সাগর হতে গুজরাট ও মুম্বাই পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। ওয়ালিদের রাজত্ব কালে ভূ-মধ্যসাগরে মুসলিম নৌবাহিনীর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, শ্রেষ্ঠ শাসক ও বিজেতা হিসেবে খলিফা ওয়ালিদের নাম ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৭

ক. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১. খলিফা ওয়ালিদ ছিলেন খলিফা _____ বড় ছেলে।

২. পিতা তাঁকে পরবর্তী _____ মনোনয়ন করে যান।

৩. পিতার মৃত্যুর পর _____ খ্রিস্টাব্দে _____ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

৪. তিনি _____ হিজরিতে _____ জন্মগ্রহণ করেন।

৫. শিক্ষা-দীক্ষাতে _____ ছিলেন। নির্ভেজাল আরব শাসক এই বাদশা শুদ্ধ _____ পর্যন্ত বলতে পারতেন না।

৬. তবে শাসনের নিয়ম-কানুন সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে _____ ছিলেন।

খ. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন?

১. খলিফা ওয়ালিদ ১০ বছর কাল রাজত্ব করেন।

২. মুহাম্মদ বিন কাসিম মধ্য এশিয়ায় অভিযান চালান।

৩. কুতাইবা চীন অভিযান চালিয়ে কাশগড় জয় করেন।

৪. মুসা বিন নুসাইর স্পেন বিজয় করেন।

৫. তারিক বিন যিয়াদ ওয়ালিদের একজন সেনাপতি ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা ওয়ালিদের পরিচয় ও প্রাথমিক কার্যাবলীর বিবরণ দিন।

২. মধ্য এশিয়া বিজয়ের কাহিনী লিখুন।

৩. স্পেন বিজয়ের সার সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৪. ওয়ালিদের সময়ে সিন্ধু বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৫. ওয়ালিদের উত্তর আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তারের বিষয়ে একটি কি টীকা লিখুন।

পাঠ ৮ খলিফা ওয়ালিদের চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলিফা ওয়ালিদের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- ওয়ালিদের চরিত্র নিরূপণ করতে পারবেন
- ওয়ালিদের কৃতিত্ব ও চরিত্রের বিবরণ দিতে পারবেন।

কৃতিত্ব

উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতাদের অন্যতম। খলিফা আব্দুল মালিকের তিরোধানের পর স্বীয় পুত্র ওয়ালিদ ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি সাম্রাজ্যের খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সুদীর্ঘ দশ বছরের রাজত্বকালে (৭০৫-৭১৫) ইসলামি সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। তিনি সুযোগ্য পিতা আব্দুল মালিকের সুযোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। ওয়ালিদ নিজে বড় রকমের যোদ্ধা বা সমরকুশলী না হলেও সৌভাগ্যক্রমে তিনি হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, কুতাইবা ইবন মুসলিম, মুহাম্মদ ইবন কাসিম, মুসা ইবন মুসাইর, তারিক ইবন যিয়াদ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত রণবিদ বীর সেনাপতিগণের সহায়তা লাভ করেন। এ সকল অমিত তেজী বীর সেনাপতিদের শৌর্যবীর্য ও সুনিপুণ রণকৌশলে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে ইসলামি পতাকা উত্তোলিত হয়। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ইতিহাসে ওয়ালিদের শাসনামল স্বর্ণযুগ হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শুধু বিজেতা হিসেবেই নয় একজন সুশাসক, শান্তি-সংহতি প্রতিষ্ঠাতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্মাতা হিসেবেও ওয়ালিদ ইতিহাসে নন্দিত হয়ে আসছেন।

সমগ্র মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলিফা

ওয়ালিদ ছিলেন মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। গীবন তাঁকে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট এবং ইউমেল তাঁকে আমিরুল মোমিনীনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও যোগ্যতম শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর পিতা আবদুল মালিকের যোগ্যতম সন্তান। মৌলিকতার দিক দিয়ে আবদুল মালিক পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও ওয়ালিদ নানা দিক দিয়ে পিতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থা দেশ-বিদেশে গৌরব অর্জন করেছিল। ওয়ালিদ হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক এবং শিয়া ও খারিজীদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাঁর শাসনে গোষ্ঠীকলহ দূরীভূত হয়।

ক্ষমতায় বসে তিনি পিতার আদর্শ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও উমর বিন আবদুল আযীযকে তিনি যথাক্রমে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের এবং আরবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে কুতাইবা বিন মুসলিমকে তিনি খুরাসানের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি কঠোর হস্তে মুদারীয় এবং হিমারীয় দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ এবং শিয়া ও খারিজী বিদ্রোহ দমন করে দেশে পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা ঃ আল-ওয়ালিদ সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের সিন্ধু, মুলতান, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ জয় করেন। তার সাম্রাজ্য আটলান্টিক হতে পিরেনীজ এবং ভারতের সিন্ধু-মুলতান হতে চীন সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যকে তিনি সুসংহত করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিজেতা হিসেবে তাঁর নাম ইসলামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

নির্মাতা ঃ তিনি স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে তিনি দেশে অসংখ্য প্রাসাদ, অট্টালিকা, সৌধ এবং মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মক্কা-মদীনার মসজিদগুলোকে প্রশস্ত, সুশোভিত এবং দামেস্কের বিখ্যাত জুম'আ মসজিদ নির্মাণ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাস্তাঘাট, পানি পানের জন্য কূপ খনন, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় এবং চিকিৎসার সুবিধার্থে হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তিনি দুর্বল, অক্ষম ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের বাইতুল মাল হতে নির্দিষ্ট হারে ভাতা প্রদানেরও ব্যবস্থা করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি সেখানে অন্ধ, পঙ্গু ও উন্মাদদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেন। এতিম ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি এতিমখানা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জনহিতকর কার্যাবলী অবশ্যই প্রশংসা ও কৃতিত্বের দাবীদার। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তারই আবিষ্কার।

শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ঃ উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। খলিফা স্বয়ং কবি ও কাব্যপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর শাসনামলে কূফা ও বসরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং কুরআন-হাদীস আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর সময় একটি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ঘড়িও আবিষ্কৃত হয়েছিল। বহু খ্যাতনামা শিল্পী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর সময়ে মক্কায় কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্পেনে লিনেন থেকে কাগজ উৎপন্ন হতে থাকে।

নৌ-বহরের উন্নতি ঃ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সামরিক সংগঠক ছিলেন। স্থলবাহিনীর পাশাপাশি তিনি নৌ-বাহিনীরও চরম উন্নতি সাধন করেন। শক্তিশালী নৌ-বহরের সহায়তায় তিনি নৌ-পথে রোমান আক্রমণের হাত থেকে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন।

ওয়ালিদের শাসনামলে পর্যটক, পথচারি ও পথিকদের সফর নিরাপদ ছিল। তাঁর শাসনকাল ছিল শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ওয়ালিদের রাজত্বকাল খিলাফত যুগের পর অন্যান্য শাসকদের তুলনায় অধিকতর গৌরবময় ও স্মরণীয়।

চরিত্র

ওয়ালিদের ব্যক্তিগত চরিত্র উত্তম ছিল। রাজোচিত ও শ্রদ্ধা উদ্রেককারী গুণাবলী তাঁকে মহিমান্বিত করেছিল। তিনি হৃদয়বান ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাও ছিল। সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, এর সংহতি বিধান এবং শান্তিপূর্ণ প্রশাসন ব্যবস্থা তাঁর দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

শান্তি বিধায়ক ঃ ওয়ালিদ পিতার কূটনৈতিক দক্ষতা ও মৌলিকতার দাবিদার না হলেও তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধায়ক ছিলেন। তিনি কঠোর হাতে মুয়াবীয় ও হিমারীয় দ্বন্দ্বকে এবং শিয়া-সুন্নী বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করে দেশে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

পরোপকারী ও মহানুভব ঃ ওয়ালিদ ছিলেন পরোপকারী, মহানুভব। আদর্শ খলিফা হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে তিনি অনেক অবদান রেখে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন- খলিফা ওয়ালিদ যে তাঁর পিতা আবদুল মালিক এবং দাদা মারওয়ানের চেয়ে দয়ালু ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বংশধরদের অনেকের চেয়ে তিনি অবশ্যই হৃদয়বান ছিলেন। খলিফা ওয়ালিদ ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, দূরদর্শী, কর্তব্য পরায়ণ এবং নীতি জ্ঞানসম্পন্ন শাসক।

তিনি অসহায় পঙ্গু ও অন্ধজনের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেন। তিনি সুখী, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেন।

ধর্মানুরাগী ঃ ধর্মের প্রতি ওয়ালিদের যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। তিনি ছিলেন কুরআন প্রেমিক। প্রতি তিন দিনে তিনি কুরআন মজীদ খতম করতেন। তাঁর শাসনামলেই হযরত আলীর (রা) শিষ্য আবুল আসওয়াদ দুয়ানী হাজ্জাজের ইংগিতে কুরআন মজীদের আরবি স্বর চিহ্ন (হরকত) প্রয়োগ করেন। ওয়ালিদ কুরআনে হাফিযদের ভাতা ও পুরস্কার দিতেন।

সার-সংক্ষেপ

ওয়ালিদের শাসনকাল ছিল সর্বোত্তম শাসন কাল। খলিফা ওয়ালিদ নিঃসন্দেহে উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা ও শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ'। তাই ঐতিহাসিক গীবন তাঁকে 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট' রূপে অভিহিত করেছেন। তাঁর খিলাফতের সময় সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা, সুখ-শান্তি, শক্তি-প্রতিপত্তি, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, সঙ্গীত-স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং প্রজাহিতকর কার্যাবলীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ঃ ৭.৮

	মিল করুন
১. খলিফা ওয়ালিদের পিতা	১. মুহম্মদ বিন কাসিম
২. আফ্রিকা বিজয়ী সেনাপতি	২. গভর্নর ও বিজেতা
৩. সিন্ধু বিজয়ী সেনাপতি	৩. ফ্লোরিন্ডা
৪. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ	৪. তারিক বিন যিয়াদ
৫. স্পেন বিজয়ী সেনাপতি	৫. কুতাইবা-বিন-মুসলিম
৬. মধ্য এশিয়া বিজয়ী	৬. খলিফা আব্দুল মালিক
৭. কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা	৮. মুসা বিন নুসাইর

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা ওয়ালিদের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।

২. খলিফা ওয়ালিদের চরিত্র বর্ণণা করুন।

পাঠ ৯ উমর ইবনে আবদুল আযীয (৭১৭-৭২০ খ্রি.)-এর শাসননীতি ও সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমর ইবনে আবদুল আযীযের পরিচয় জানতে পারবেন
- উমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফত লাভের বর্ণনা দিতে পারবেন
- উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসননীতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন
- উমর ইবনে আবদুল আযীযের রাজস্বনীতি, ধর্মীয়নীতি এবং বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- উমর ইবনে আবদুল আযীযের সংস্কারসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

পরিচয়

উমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন খলিফা মারওয়ানের দৌদিত্র। তাঁর মা ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এর নাতনী উম্মে হামিম। তিনি খলিফা আব্দুল মালিকের ভাই এবং এক সময় মিশরের শাসন কর্তা আব্দুল আযীযের পুত্র। তিনি মালিক আব্দুল মালিকের কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করেন। হযরত ওমরের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থাকায় ওমর বিন আব্দুল আযীয সাধারণত "দ্বিতীয় ওমর" বলে পরিচিত। তারা উভয়ই ধর্মপ্রাণ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সরল প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর মত একজন ধার্মিক এবং ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির খিলাফত লাভ উমাইয়া শাসন ব্যবস্থার উপর গভীর প্রস্তাব বিস্তার করে। উমাইয়া বংশের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমরের অভিষেক সত্যই একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বর্বতা, ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, বিলাসিলতা, অনাচার ও অধর্ম যখন সমস্ত উমাইয়া খিলাফতকে গ্রাস করতে থাকে তখন তিনি শাসন ভার গ্রহণ করেন। তিনি উমাইয়াদের স্বেচ্ছাচারী নীতি বর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ অনুসরণ করেন। এজন্য তাঁকে "উমাইয়া সাধু" (Umayyad Saint) এবং "পঞ্চম খলিফা" বলা হয়।

খিলাফত লাভ

খলিফা আল ওয়ালিদের মৃত্যুর পর ছোট ভাই সুলাইমান মুসলিম জাহানের খলিফা হন। সুলাইমান ছিলেন উদার ও ধর্মপ্রাণ। তিনি কূটকৌশলীও দক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি মাত্র দু বছর আট মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর চাচাত ভাই সৎ ও পূত্ত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী উমর ইবনে আব্দুল আযীযকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন নীতি

উমর ইবনে আবদুল আযীয ওয়ালীদের শাসনকালে হিজাজের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। খলিফা হিসেবে তাঁর শাসন নীতির মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আনয়ন ও প্রজা সাধারণের মঙ্গল বিধান। রাজ্য জয় অপেক্ষা তিনি রাজ্য সংরক্ষণের পক্ষপাতি ছিলেন। আবদুল মালিক ও ওয়ালিদ বল প্রয়োগ করেও প্রজাদের যে শান্তি দিতে পারেননি দ্বিতীয় উমর তা বিনা রক্তপাতে দিয়েছেন। তাঁর শাসন ছিল দল ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ। দল, গোত্র ও স্বজনপ্রীতির সংকীর্ণতা এই মহৎ প্রাণ শাসকের উপর এতটুকুও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনিই সর্বপ্রথম ক্ষমতালোভী উমাইয়া শাসকদের চিরন্তন নিয়োগ নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে দল-গোত্র নির্বিশেষে সৎ, যোগ্য ও প্রজাহিতৈষী গভর্নরদের নিয়োগ করেন। তাঁর সময় খোরাসানের শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লিব তহবিল তসরূপের অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং স্পেনের আল্লার ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য অপসারিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় উমর হাশিমীদের প্রতি উমাইয়াদের অন্যায়ের ক্ষত চিহ্ন মোচনে ব্রতী ছিলেন। আমীরে মুয়াবিয়ার সময় হতেই ইসলামের যে সমস্ত সাধারণ সম্পদ উমাইয়াদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল তিনি ঐগুলো পুনরায় সাধারণ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেন। মুয়াবিয়া কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত ফিদাক বাগানের মালিকানা তিনি রাসুলুল্লাহর বংশধরদের ফিরিয়ে দিয়ে মহত্বের পরিচয় দেন। আব্দুল মালিকের দখলকৃত হযরত তালহার সম্পত্তিও তাঁর পরিবারবর্গকে ফেরৎ দেন। পূর্ববর্তী উমাইয়াগণ হযরত আলী এবং রাসুলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের খুতবায় অভিসম্পাত করতেন। তিনি

তাও বন্ধ করেন। তিনি মজলিস উশ-শুরার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুলাফায়ে রাশিদার সাবেক রীতি পুনঃ প্রবর্তন করেন। তিনি শুরার পরামর্শ মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

উমর ইবনে আবদুল আযীয বিশ্বাস করতেন যে, বিভেদ নীতি দ্বারা খিলাফতের মঙ্গল হতে পারে না। সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা না থাকলে কোন বৃহত্তর মঙ্গল অর্জন তথা সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি আরব ও অনারব মুসলমানদের পার্থক্য তুলে দেন এবং জিম্মীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেন। অনারব মুসলমানদেরও সরকারি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়। তাদেরকে জিযিয়া হতে অব্যহতি দিয়ে আরবদের সমপর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

উমর ইবনে আবদুল আযীয রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পূর্ণ ইসলামিকরণে নিরলস কাজ করেন। অনুগত সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার তিনি রক্ষা করতেন। তাদের মধ্যকার যোগ্য ব্যক্তিদেরকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করতেন। মুসলিম কর্মচারীর অভাব ঘটলে তিনি যোগ্য খ্রিস্টান ও ইহুদীদের নিয়োগ করতেন। রাসুলুল্লাহ (স)-এর সময় নাজরানের খ্রিষ্টানগণ বায়তুল মালে দু হাজার বস্ত্রখণ্ড প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে ধর্মান্তর ও বাস্তুত্যাগের ফলে খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা হ্রাস পেলেও হাজ্জাজ তাদের কর হ্রাস করেননি। মহানুভব দ্বিতীয় উমর সহনশীলতার বশবর্তী হয়ে উক্ত সংখ্যার দেয় বস্ত্রখণ্ড হ্রাস করে মাত্র দু'শত খণ্ডে নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি উমাইয়াদের চিরশত্রু খারিজীদের প্রতিও উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। তারা তাঁর শাসন ও ধর্মীয় নীতির প্রতি সমর্থন যুগিয়েছিল। উমাইয়া শাসকদের মধ্যে দ্বিতীয় উমরই একমাত্র ব্যতিক্রম যাকে খারিজীরা স্বীকৃতি দিয়েছে। তারপর খিলাফতকালে গোলযোগ করা হতে বিরত থাকে।

রাজস্ব নীতি

অমুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য উমর ইবনে আবদুল আযীয তাদেরকে যথেষ্ট আর্থিক সুবিধা দান করেন। অপরদিকে মাওয়ালীদের করভারও লাঘব করে দেন। যার ফলে রাজকোষে কিছুটা অর্থ সংকট দেখা দিয়েছিল। তবে অর্থনৈতিক এ সংকট দূর করার জন্য তিনি বিভিন্ন বলিষ্ঠ ভূমিকা অবলম্বন করেন। পূর্বে বিজিত এলাকার অমুসলমানদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা হত। পরে হাজ্জাজ নব-দীক্ষিত মুসলিম মাওয়ালীদের উপর এ কর ধার্য করেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয শুধু ইহুদী-খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণ করতেন। এতে আয় সীমিত হলেও খলিফার ধার্মিকতা ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন মুসলমানকে রাজস্ব বা খারাজ প্রদান করতে হত না। তাদের উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ, খারাজের পরিবর্তে এক দশমাংশ উশর ছিল। অমুসলমানগণ খারাজ হতে অব্যহতি পাওয়ার আশায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। কারণ ধর্মান্তরের ফলে জিযিয়া ও খারাজ হতে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনা ছিল। এমনিভাবে তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধন করেন। উমর নির্দেশ দেন যে যদি কোন অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার জমি তার গ্রামের কোন অমুসলমান ভাইকে প্রদান করে শহরে যেতে পারে। এর ফলে ভূমিহীন হয়ে মাওয়ালীগণ ভূমির রাজস্ব হতে অব্যহতি পেতো। মুসলমানদের খারাজ দিতে হত না। কিন্তু অমুসলমান ভুস্বামীগণ ভূমি রাজস্ব দিতে বাধ্য ছিল। এভাবে সরকারের আয় বৃদ্ধি পেল। একটি ফরমান জারির মাধ্যমে তিনি ১০০ হিজরির পর হতে মুসলমানদের নিকট অমুসলমানদের ভূমি বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন। এ ছাড়া তিনি মুসলিম ও অমুসলিম প্রজাদের উপর ভূমিকর (যথাক্রমে উশর ও খারাজ) বাধ্যতামূলক করে এবং জিযিয়া ও খারাজের পার্থক্য নির্দেশ করে অর্থ-সংকট নিরসনের চেষ্টা করেন। উমাইয়াদের ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চিত অতিরিক্ত ধন-সম্পদও রাজকোষে জমা দেয়ার জন্য খলিফা আহবান জানান। এর ফলে উমর ইবনে আবদুল আযীযের রাজস্ব ব্যবস্থা রাজকোষের ঘাটতি পূরণ করেন। সরকারের রাজস্ব আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

ধর্মীয় নীতি

উমর ইবনে আবদুল আযীয মনে প্রাণে খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলতেন। খলিফা হিসেবে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র শরীয়তের অনুশাসনই প্রজাদের নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। তিনি সিন্ধু, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও স্পেন প্রভৃতি নববিজিত স্থানসমূহে ধর্মতাত্ত্বিকদের প্রেরণ করে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটান। একদা মিসরের গভর্নর সোরাইয়া এ মর্মে খলিফার নিকট অনুযোগ করেন যে অবাধ ধর্মান্তর অব্যাহত থাকলে শীঘ্রই রাজকোষ দেউলিয়াত্বের সম্মুখীন হবে। প্রত্যুত্তরে উমর বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (স) ধর্মপ্রচারক ছিলেন, খাজনা আদায়কারী ছিলেন না। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ সাধক ও খাদেম ছিলেন। এ মহান তাপস খলিফা প্রায়ই বলতেন যে, আত্মশুদ্ধি, ন্যায়বিচার ও

সহৃদয়তা ব্যতীত ধর্ম রক্ষা হয় না। তিনি গোঁড়া তৌহিদপন্থী হলেও তাঁর মধ্যে ধর্মান্ধতা ছিল না। সাবেক সন্ধির শর্তানুযায়ী খ্রিস্টান ও ইহুদীরা যে সকল গীর্জা ও মন্দিরের অধিকারী ছিল এবং যা পূর্ববর্তী খলিফাগণ ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেগুলোকে পুনঃ নির্মাণের অনুমতি ও সংরক্ষণের আশ্বাস দেন। একবার উমর তাঁর তরুণ পুত্র আবদুল মালিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যে, তিনি (উমর) কেন সামাজিক পাপাচার ও বিধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল করে দেন না। উত্তরে তিনি জানান যে তরবারির সাহায্যে সংস্কার সাধনে কোন মঙ্গল নিহিত নেই, যা সাগ্রহ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কেবল তাই মঙ্গলজনক। এ উক্তি হতে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা, সংযম ও পরমত সহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয়।

বৈদেশিক নীতি

শান্তি, ন্যায় ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী দ্বিতীয় উমরকে যুদ্ধাভিযান বা পররাজ্য জয়ের বাসনা আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি পূর্ববর্তী শাসক কর্তৃক প্রেরিত সকল সীমান্ত অভিযান বন্ধ করে দেন। মাসলামার নেতৃত্বে কন্সস্টান্টিনোপলের প্রাচীন দেশে খাদ্য ও রসদাভাবে আটকা পড়েছিল, তিনি তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। আল হুরের শাসনাধীন স্পেনে গোলযোগ দেখা দিলে তিনি আস্সামকে সেখানে শাসনকর্তা নিয়োগ করে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় উত্তর স্পেনের বিদ্রোহী খ্রিস্টানদের অবিশ্রান্ত হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আস্সাম তাঁর বাহিনীসহ পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ফ্রান্স বিধ্বস্ত করেন। ফলে আরবদের সাথে একুইটেনের ডিউক ইউডের্গ ও ফ্রান্সের চালর্স মার্টেলের সংঘর্ষ বাঁধে। কিন্তু তুলসে আস্সাম নিহত হন। অতঃপর তাঁর সহকারী আবদুর রহমান সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে আরব বাহিনীকে স্পেন সীমান্তে ফিরে আনেন।

উমর ইবন আবদুল আযীযের সংস্কার

খুলাফায়ে রাশিদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ উমর ইবন আবদুল আযীয ৭১০ সালে বংশানুক্রম ধারার রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর যদিও ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তবুও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণরূপে খুলাফায়ে রাশিদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। তিনি ইসলামের উপর সমাচ্ছন্ন জাহিলিয়াতকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে উল্টিয়ে ফেলে, ইসলামি খিলাফতের আদর্শকে বাস্তবায়ন করেন। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশে ইসলাম বিরোধী জাহিলী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন সাধন করে খুলাফায়ে রাশিদা প্রতিষ্ঠিত করার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কর্তব্য পালনে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি বাইতুল মালকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করেন। ইসলামি খিলাফত নীতিতে সমষ্টির জন্য কল্যাণকর অর্থ-সম্পদকে ব্যক্তি বা কোন বংশের পক্ষের কুক্ষিগত করার কোন অবকাশ নেই। উমাইয়া শাসকরা জনগণের সম্পদে রাজতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির সুবাদে অন্যায়ভাবে তা ভোগ-দখল করে নিয়েছিল। উমার ইবন আবদুল আযীয খিলাফতে আরোহন করে এ কুপ্রথা উচ্ছেদ করে তা সবই বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন।

ইসলামি শরী'আতের প্রতিষ্ঠা ঃ উমর ইবন আবদুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরই পরিপূর্ণ ইসলামি শরী'আতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিপূর্ণভাবেই ইসলামি শরী'আ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সফলতার কারণেই তিনি ইসলামের দ্বিতীয় উমর উপাধিতে ভূষিত হন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে কেবল তিনিই মজলিশে শুরা প্রতিষ্ঠা করে তাদের পরামর্শ মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

বংশীয় রেষারেষীর মূলোৎপাটন ঃ উমর ইবন আবদুল আযীয খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বনু হাশিম ও বনু উমাইয়াদের মধ্যে চলমান হিংসা-বিদ্বেষ, রেষারেষি ও পরস্পরের রক্তলোলুপতা দূরীভূত করার চেষ্টা করেন। জুমু'আর খুতবা পাঠের সময় হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অভিসম্পাত দানের রীতি বন্ধ করে দিয়ে তাদের জন্য দু'আর ব্যবস্থা করেন। 'ফিদাক'-এর বাগানটি তিনি রাসূলুল্লাহর (স) বংশধরদেরকে ফিরিয়ে দেন। বাজেয়াপ্তকৃত হযরত তালহার (রা) সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীগণের কাছে প্রত্যর্পণ করেন। তিনি হাশিমী বংশীয়দেরকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজকার্যের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তাঁর উদারনীতি ও গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বনু হাশিম ও বনু উমাইয়াদের মধ্যকার তিক্ততা ও হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যায়।

আরব-অনারব বৈষম্য দূর ঃ ইসলামি সাম্রাজ্যের বুনিয়াদকে সুসংহত করার লক্ষ্যে আরব-অনারব মুসলমানদের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য ভেদাভেদ তুলে দিয়ে খলিফা দ্বিতীয় উমর সকলের সমান মর্যাদা দান করেন। তিনি সকলকে সমানভাবে রাজকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেন।

অমুসলমানদের প্রতি উদারতা ঃ খলিফা দ্বিতীয় উমর অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিও ছিলেন সমান সহানুভূতিশীল। তারা নিজ নিজ ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। এক সময় দামেস্কের খ্রিস্টানরা সেন্টপলের গীর্জাটি ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন জানালে খলিফা তাদেরকে ফেরত দিতে অপারগ হওয়ায় তার পরিবর্তে সেন্টমাসের গীর্জাটি তাদেরকে দেন। নাজরানের খ্রিস্টানরা অতিরিক্ত করভারের অভিযোগ করলে খলিফা তাদের করভার লাঘব করে দেন।

খারিজীদের প্রতি উদারতা ঃ হযরত দ্বিতীয় উমর উমাইয়াদের দুশমন খারিজীদের প্রতিও উদার মনোভাব প্রদর্শন করেন। তাঁর উদার মনোভাবের দরুন তাঁর খিলাফতামলে আরব ও আফ্রিকার খারিজীরা কোন প্রকার বিদ্রোহ করেনি। খারিজীরা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, খারিজীরা উমাইয়া বংশের একমাত্র উমর ইবন আবদুল আযীযকেই বৈধ খলিফা বলে স্বীকার করেন।

মাওয়ালীদের অবস্থার উন্নয়ন ঃ মাওয়ালী বলা হয় সে সকল লোকদেরকে যারা ক্রীতদাস হিসেবে মুসলমানদের অধীনে ছিল, পরে মুক্ত করে দিলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। মাওয়ালীরা ইসলামের খিদমতে বহু ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করা সত্ত্বেও এ যাবত তাদেরকে তেমন কোন অধিকার লাভ ও ভোগ করতে দেয়া হত না। তিনি আরবীয়দের মত মাওয়ালীদেরকে সহযোগিতা করেন এবং খারাজ লাঘব করেন। জিযিয়া কর মওকুফ করে দেন। তাদের যুদ্ধরত সৈনিক পরিবারকে বাইতুল মাল হতে বৃত্তিদান করেন।

ইসলামের সম্প্রসারণ ঃ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ অপেক্ষা ইসলামের সম্প্রসারণে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে সে জিযিয়া কর প্রদান হতে মুক্তি পাবে এবং মুসলমানদের সমঅধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তাঁর এ ঘোষণার ফলে তিনি অল্প দিনের মধ্যে খোরাসান, বুখারা, সমরকন্দ, নিশাপুর, খাওয়ারিজম প্রভৃতি স্থানে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হন। খলিফা বলেন যে, "আল্লাহর রাসূল ধর্মপ্রচারক ছিলেন, খাজনা আদায়কারী ছিলেন না।" আরেকবার খোরাসানের গভর্নর নবদীক্ষিত মুসলমানদের খাৎনা করার আদেশ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "মানুষ সত্য দ্বীনের দিকে আহবান করার জন্যই নবীকে পাঠানো হয়েছিল, খাৎনা করার জন্য নয়।

বাইতুলমাল সাধারণ মুসলমানদের সম্পদ ঘোষণা

বাইতুলমাল (সরকারি কোষাগার) সম্পর্কে উমর ইবনে আবদুল আযীয ঘোষণা করেন, এটা মুসলমানদের সম্পদ। এটা সাম্যের বিধান অনুযায়ী বন্টন হবে। উমাইয়াগণ এটাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে ফেলেছিল। ঘোষণাটি উমাইয়াদের পছন্দ হয়নি। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দেয়। তবে খলিফার দৃঢ়তার মুখে তারা নিশ্চুপ থাকে।

সর্বত্র ন্যায়বিচারের আদেশ

উমর ইবনে আবদুল আযীয নিজে শরীয়তের খাঁটি অনুসারী ছিলেন। তিনি চাইতেন যেন সকল মুসলমান শরীয়তের মত চলে। তাই তিনি সকল শাসক ও আলিমদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় যেখানেই ত্রুটি প্রকাশ পায়, তাৎক্ষণিকভাবে তা দূর করবে এবং সেখানেই শরীয়তের বিধান প্রবর্তন করবে। দেশে অত্যাচার-নির্যাতনের পথ সমূলে উৎপাটিত করবে। সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে ও সৎ কর্মের প্রসার ঘটাবে, জনকল্যাণমূলক কাজ করবে, ধর্ম প্রচারে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করবে।

শাসকদের কাজের তদারকী

তিনি শুধু নির্দেশ দিয়েই বসে থাকতেন না, আমীরদের দুর্বলতা ত্রুটি-বিচ্যুতির কৈফিয়ত তলব করতেন। পূর্বেকার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। যেমন ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লাব সুলাইমানের প্রিয় গভর্নর ছিলেন। বাইতুল মাল হতে তিনি অবৈধভাবে বিপুল সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে বন্দী করেন। তার পুত্র মুখাল্লাদ এসে আবেদন করল, আমীরুল মোমেনীন। আল্লাহ আপনাকে এ জাতির খলিফা বানিয়ে এর প্রতি অনেক করুণা করেছেন। আমরা কেন আপনার দয়া হতে বঞ্চিত হব। তিনি উত্তর দেন, এ ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমানদের এটা আমার একার নয়। আমি কিভাবে একা মাফ করতে পারি? বাইতুলমালের পূর্ণ মুদ্রা পরিশোধ করা হলেই মুক্তি দেয়া হবে।

হাদীসশাস্ত্র সংকলন ঃ মহানবীর (স) হাদীসশাস্ত্র সংকলন খলিফা 'উমর ইবনে আব্দুল আযীযের সবচেয়ে বড় এবং অমর কৃতিত্ব। সাহাবীদের অন্তর্ধানের সাথে সাথে হাদীসশাস্ত্র বিকৃত ও বিলুপ্তির আশংকায় তিনি সরকারিভাবে মহানবীর (স) হাদীসসমূহের সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই অনন্য অবদানের ফলে মহানবীর (স) হাদীস আজ নির্ভুলভাবে আমরা পেয়েছি।

জনকল্যাণ ও খিলাফতের সমৃদ্ধি ঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁর স্বল্প পরিসরের খিলাফতকালে ইসলামি সাম্রাজ্য এবং নাগরিকগণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তিনি নাগরিকদের নৈতিক সংশোধন ও সংস্কারের কাজে হাত দেন, তাঁদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও নৈতিক স্বচ্ছতা এবং উৎকর্ষ বিধানের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি কৃষি ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত, সরাইখানা প্রভৃতি জনহিতকর কার্যাবলীর দ্বারা সর্বত্র সমৃদ্ধির জোয়ার এনেছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত উরম ইবনে আবদুল আযীয ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল নাম। তাঁর রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকল উমাইয়া খলিফা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। উমাইয়া বংশের সিংহাসনে আরোহন করলেও উমাইয়া শাসননীতি ও শাসনব্যবস্থা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ না করে রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসারী খুলাফায়ে রাশিদার শাসননীতির বাস্তব অনুসরণ করেন। এজন্য তিনি খুলাফায়ে রাশিদার পঞ্চম খলিফা বলে ইসলামের ইতিহাসে স্থান দখল করে আছেন। তাঁর রাজত্বকাল (৭১৫-৭১৭) সুষ্ঠু প্রশাসনিক নীতি, শাসন সংস্কার, জনহিতকর কার্যাবলী ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন সুদক্ষ ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক, আল্লাহতে নিবেদিত, ধর্মভীরু, উদার, সৎ, মহৎ, দানবীর ও সাহসী বীরসেনানী। এ সকল বিরল গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের সাথে তুলনা করে তাঁকে দ্বিতীয় উমর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

উমাইয়া শাসকগণের স্বৈরতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীন শাসনের যাঁতাকলে যখন মুসলিম উম্মাহ অতীষ্ট, হযরত আলীর (রা) অনুসারীরা নি□ষিত, এমন যুগসন্ধিক্ষণে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খিলাফতের মসনদে সমাসীন হন। রাজতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে পূর্ণ ইসলামি খিলাফতের নমুনায় ঢেলে সাজান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৯

এক কথায় উত্তর দিন-

১. উমর ইবনে আব্দুল আযীয কে ছিলেন?
২. তাঁকে দ্বিতীয় উমর বলা হয় কেন?
৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলিফা কাকে মনে করা হয়? কেন?
৪. তিনি দৈনিক কত খরচ করে জীবন যাপন করতেন?
৫. হাশেমীদের প্রতি তাঁর নীতি কেমন ছিল?
৬. খারিজীদের প্রতি তাঁর নীতি কি ছিল?
৭. মাওয়ালী কারা?
৮. বাইতুল মালের ব্যাপারে উমর ইবনে আবদুল আযীযের ঘোষণা কি ছিল?
৯. কোন শাস্ত্র সংকলনে উমর ইবনে আবদুল আযীযের সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের পরিচয় দিন।
১০. উমাইয়াদের মধ্যে কোন খলিফা শরীআতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের পরিচয় দিন এবং তাঁর খিলাফত লাভ বর্ণনা দিন।
২. খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের অভ্যন্তরীণ শাসন নীতি বর্ণনা করুন।
৩. দ্বিতীয় উমরের রাজস্ব নীতি কেমন ছিল?
৪. তাঁর ধর্মীয় নীতি ব্যাখ্যা করুন।
৫. উমর জীবনে আবদুল আযীযের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সমূহ বিশ্লেষণ করুন।

উমর ইবনে আবদুল আযীযের চরিত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমর ইবনে আবদুল আযীযের চরিত্র কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন;
- উমর ইবনে আবদুল আযীযকে কোন খুলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলিফা বলা হয় তার বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- উমর ইবনে আবদুল আযীয উমাইয়াদের পতনের জন্য যে দায়ী নয় তা নিরূপণ করতে পারবেন।

ন্যায়নিষ্ঠা

উমর ইবনে আবদুল আযীয-এর ন্যায়বিচার, সরলতা, ধর্মের প্রতি অনুরাগ, অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রভৃতি গুণে উমাইয়া সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে ছিলেন অতুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি উমাইয়া খলিফা না হয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে আবির্ভূত হলে অধিক শোভনীয় হত।

আদর্শবান

তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে চলতেন। তাঁর নিজের এবং পরিবারের জীবন অত্যন্ত সাধারণ ছিল। তিনি হযরত উমরের মত তালিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করতেন। তাঁর স্ত্রীর সমস্ত যৌতুক ও অলংকারসমূহ বিক্রয় করে তিনি বায়তুল মালে জমা দিয়েছিলেন। কারণ আবদুল মালিক তা বাইতুল মাল হতে দিয়েছিলেন। রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমক পরিহার করে চলতেন এবং সরকারি অশ্বশালার সমস্ত অশ্ব নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাইতুল মালে জমা করেন। তিনি দৈনিক ব্যয়ের জন্য মাত্র দু দিরহাম বাইতুল মাল হতে গ্রহণ করতেন। উমাইয়াদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন সততা, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতার প্রতীক। সর্বাবস্থায় উমর ইবনে আবদুল আযীয কুরআন হাদীসের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করতেন। ধনী-দরিদ্র, আরব-অনারব কোন ভেদাভেদ তিনি পছন্দ করতেন না। সকল অসাম্য বিদুরিত করে তিনি ইসলামি ঐক্য ও সংহতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু এবং প্রজার সন্তোষ বিধানই তার জীবনের ব্রত ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর আদর্শকে উপক্ষো করা হয়।

গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী

উমর ইবনে আবদুল আযীয ধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি কুরআন শরীফের হাফিয ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন হাদীসের প্রতিটি অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করতেন। তাঁরই চেষ্টায় সিন্ধুদেশ আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরণ করা হয়। তাঁর ধর্মানুরাগের জন্য তাঁকে মুজাদ্দিদ বা ধর্মসঞ্জীবক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

উদারতা

অমুসলমানগণও তাঁর উদার শাসনে পরিপূর্ণ জান-মাল ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। উমাইয়া শাসন বিদ্বেষী খারিজীগণ তাঁকে ন্যায়সঙ্গত খলিফা বলে স্বীকার করত। সকল ধর্ম শ্রেণী ও বর্ণের লোকদের মঙ্গল সাধন করাই খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের লক্ষ্য ছিল।

প্রজাবৎসল

তাঁর আমলে কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। পথিক ও হজ্জ যাত্রীদের সুবিধার জন্য সারাদেশে বহু সরাইখানা তিনি নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে প্রজাগণ এত সুখে শান্তিতে বসবাস করত যে যাকাত নেয়ার মত গরীব খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। তবে মাত্র আড়াই বছরের খিলাফতকালে তিনি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তব রূপ প্রদান করে যেতে পারেননি।

সত্যবাদিতা ঃ উমর ইবনে আবদুল আযীয বলতেন, যখন আমি জানতে পারলাম, মিথ্যা বলা পাপ, তখন হতে আমি কখনও মিথ্যা বলিনি। ওহাব ইবনে মুনবাহ বলেন, যদি এই উম্মতের কোন মেহদী হতেন, তবে উমর ইবনে আবদুল আযীযই হতেন।

ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে পঞ্চম খলিফা বলা হয় কেন?

খলিফা উমর ইবনে আযীযকে ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশিদার পঞ্চম খলিফা বলা হয়। পঞ্চম খলিফার এই দুর্লভ খিতাব তাকে যে সব কারণে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে

১. তিনি তাঁর রাজত্বকালে ইসলামি খিলাফতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছিলেন।
২. তাঁর রাজত্বকালে তিনি রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসারী খুলাফায়ে রাশিদার মত নীতিতে রাজ্য পরিচালনা করেন।
৩. তিনি শরী'আতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।
৪. বাইতুল মালকে তিনি জনগণের সম্পত্তি হিসেবে মনে করতেন।
৫. তিনি বাইতুল মাল থেকে সামান্য পরিমাণ মাসোহারা নিতেন।
৬. তিনি স্বয়ং এবং পরিবারের সকলে অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।
৭. দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুকের মতই তিনি শাসনকার্য চালাতেন।
৮. তিনি নিজের সহায়-সম্পত্তি এবং স্ত্রী ফাতিমার সব রকমের গহনাপত্র বিক্রয় করে বাইতুল মালে জমা দিয়েছিলেন।
৯. প্রজা সাধারণের ও ইসলামের জন্য নিবেদিত ছিলেন তিনি সবসময়।
১০. অত্যন্ত উন্নত চরিত্র, তার সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন উমাইয়া রাজত্বকালের মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান সদৃশ্য।

তাই মুসলিম উম্মাহ তাঁকে পঞ্চম খুলাফায়ে রাশিদীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি উমাইয়া বংশের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী?

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "দ্বিতীয় উমর সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে শাসন সংস্কার করলেও তাঁর নীতি সফল হয়নি।" অন্যান্য কিছু ঐতিহাসিক তাঁর উদারনীতি, রাজত্ব, ধর্ম ও বিদেশ নীতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী মনে করেন। কিন্তু এটা সত্য নয়। ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ বিচার ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর গৃহীত নীতি উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী না হয়ে বরং তার স্থায়িত্বের অনুকূল হয়েছিল।

পর্যালোচনা

প্রথমত ঃ হাশিমী ও হযরত আলীর (রা) সমর্থকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তিনি কোন ভুল করেননি। অনারব মুসলমানদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেও তিনি ভুল করেননি। কেননা হাশিমী ও আলীর সমর্থকগণ উমাইয়া বংশের প্রতি বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় উমরের খিলাফতকে সাদরে গ্রহণ করেন। বরং উমাইয়া বংশের পতনের জন্য তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী খলিফাদের দমন নীতিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। অনারব মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা দানে উমাইয়া বংশের পতন নয়, বরং স্থায়িত্বের পক্ষেই কাজ হয়েছিল। আর এটা ছিল তাঁর অত্যন্ত সুবিবেচনা প্রসূত এবং যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়ত ঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী খলিফাগণ খারিজীদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিলেন বলে খারিজীগণ তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রাখে। অথচ খলিফা উমরের উদারনীতিতে তারা তাঁকে স্বীকৃতি দেয় ও আনুগত্য প্রকাশ করে। এমনকি তাঁর আমলে তারা একবারও বিদ্রোহ করেনি। কাজেই খারিজীদের প্রতি অন্যদের দমননীতিই দেশময় গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং উমাইয়া বংশ পতনের পথ উন্মুক্ত করে।

তৃতীয়ত ঃ তাঁর ধর্মীয় উদার নীতিতে যদিও কিছু লোক কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তিনি টের পেয়ে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীর দখলী ভূমির উপর খারাজ ধার্য করে বাইতুল মালকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। ইসলাম প্রচার করে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালীই করেছেন- এটা কোন অন্যায় নয়। আর এটা উমাইয়া বংশ পতনকে ত্বরান্বিতও করেনি।

চতুর্থত ঃ খলিফা উমর ইবন আবদুল আযীযের যুদ্ধবিরোধী বিদেশ নীতিও উমাইয়াদের পক্ষে ক্ষতির কারণ ছিল না। কেননা প্রথম উমর এবং ওয়ালিদ যে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন ঐ সময় তা আর বিস্তৃতির প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল সেখানে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার। অবশ্য সামরিক বিভাগের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন তাঁর উচিত হয়নি।

সার-সংক্ষেপ

তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা, কঠোরতা, হিংসাদ্বেষ, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলাই উমাইয়া বংশের পতন ডেকে আনে। এজন্য দ্বিতীয় উমরকে দায়ী করা ইতিহাস বিকৃত করারই নামান্তর মাত্র। আর এটা হয়েছে সত্যিকার ইসলাম বিদ্বেষী মহল থেকেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.১০

শূন্যস্থান পূরণ করুন-

১. খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীযকে ইসলামের ইতিহাস _____ পঞ্চম খলিফা বলা হয়।
২. তিনি তাঁর রাজত্ব কালে _____ খিলাফতের পরিপূর্ণ _____ করেছিলেন।
৩. তিনি _____ কে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।
৪. বাইতুল মালকে তিনি _____ সম্পত্তি হিসেবে মনে করতেন।
৫. তিনি _____ _____ থেকে সামান্য পরিমাণ মাসহারা নিতেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের চরিত্রের বিশেষ দিকগুলো বর্ণনা করুন।
২. ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে পঞ্চম খলিফা বলা হয় কেন?
৩. তিনি উমাইয়া বংশের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী?

পাঠ ১২ খলিফা হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) এর নীতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিশামের রাজত্বকালের বিবরণ দিতে পারবেন
- হিশামকে কেন উমাইয়া বংশের তৃতীয় ও শেষ মহান খলিফারূপে আখ্যায়িত করা হয়- তা নিরূপণ করতে পারবেন
- হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিচয়

খলিফা আবদুল মালিকের চতুর্থ পুত্র ছিলেন হিশাম। তিনি ৭২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭২০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় উমরের মৃত্যুর পর আবদুল মালিকের তৃতীয়পুত্র দ্বিতীয় ইয়াযীদ সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন দুর্বল, অমিতব্যয়ী, স্বৈরাচারী ও অযোগ্য শাসক। ৭২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।

৭২৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক দামেশকের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের শেষ কর্মদক্ষ ও সফল খলিফা। পিতা আবদুল মালিক এবং ভ্রাতা ওয়ালিদের ন্যায় প্রতিভাবান না হলেও তিনি দ্বিতীয় ইয়াযীদ অপেক্ষা অনেক দক্ষ শাসক ছিলেন। অধ্যাপক হিট্টি তাকে উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সময়ে শাসন ব্যবস্থা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে।

সিংহাসনে আরোহন করেই তিনি নানা জটিল ও সঙ্কটজনক সমস্যার সম্মুখীন হন। তার পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের অযোগ্যতা ও কুশাসনের কারণে সাম্রাজ্যের সমস্যাবলী আরো জটিল আকার ধারণ করে। এ সময় মুদারীয় হিমারীয় দ্বন্দ্ব, খারেজী উপদ্রবে সাম্রাজ্যের শান্তি একেবারে বিপন্ন হয়। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর যাবত এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করেও উমাইয়া বংশের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন।

রাজ্য শাসনে হিশামের নীতি ঃ উমাইয়া বংশের খলিফাগণ সকলেই দলীয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই হয়ত মুদারীয়, না হয় হিমারীয় দলের সমর্থক ছিলেন। একমাত্র দ্বিতীয় ওমর সাময়িকভাবে এ দুই বিরোধী দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করে তাদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ হন। এ সময় খলিফা দ্বিতীয় ইয়াযিদের অনুগ্রহপুষ্ট মুদারীয়গণ সাম্রাজ্যে ভীষণ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে। সম্ভবত তাদের প্রাধান্য ও দৌরাত্ম্য খর্ব করার জন্য হিশাম হিমারীয়দের পৃষ্ঠপোষক হন।

তাঁর সময় পূর্ববর্তী খলিফার আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত কতিপয় অযোগ্য মন্ত্রী ও অপদার্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তার কুশাসনে জনগণ অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তাই খলিফা হিশামকে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহে কয়েকজন গভর্নর রদবদল করতে হয়। তিনি ইরাকে ওমর বিন হোবায়রার স্থলে ইয়েমেনী ভাবাপন্ন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসরীকে নিয়োগ করেন এবং খালিদের ভ্রাতা আসাদ আল কাসরীকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

বিদ্রোহ দমন

ইরাকে বিদ্রোহ দমন ঃ ইরাকের নব নিযুক্ত শাসনকর্তা খালিদ কৌশলে মুদারীয় ও হিমারীয় সংঘর্ষ বন্ধ করেন। তার সুশাসনের দ্বারা তিনি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আস্থাভাজন হন। এ সময় খারিজীরা ইরাকের কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্রোহ করলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। ১৫ বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করার পর খলিফা হিশাম অর্থ আত্মসাত বা আলী বংশীয়দের প্রতি খারাপ উক্তির অভিযোগে খালিদকে অপসারণ করে মুদারীয় বংশীয় ইউছুফ বিন উমরকে ৭৩৯ সালে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর শাসনকালে হযরত ইমাম হুসাইনের পৌত্র জায়িদ কুফায় ফিলাফত দাবি করলে ইউসুফ বিন ওমর তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। জায়িদের মৃত্যু উমাইয়া বিরোধী আব্বাসী আন্দোলন বেগবান করেছিল।

খোরাসানের বিদ্রোহ দমন ঃ আমু নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত সাগোদের অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করলে জিযিয়া দিতে হবে না- এ প্রতিশ্রুতিতে মুসলমান হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে পুনরায় তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করার প্রস্তাব উঠলে তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ অবস্থায় ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে খালিদ আল কাসরী তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসাদ আল কাসরীকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আসাদ ৭৩৬ সালে সাগোদের অধিবাসীদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিদ্রোহী সাগোদের সমর্থনকারী তুর্কী উপজাতি নেতা খানকেও তিনি পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর আসাদ বলখে খোরাসানের রাজধানী স্থাপন করেন এবং সেখানে শান্তি স্থাপন করেন। অচিরেই

আসাদ মৃত্যুবরণ করলে নসর বিন সাইয়্যাবকে গভর্নর নিয়োগ করা হয়। নসর ছিলেন খোরাসানের শেষ উমাইয়া গভর্নর। তিনি সার্ভে খোরাসানের রাজধানী স্থাপন করেন।

উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ দমন ঃ খলিফা হিশামের খিলাফতের প্রথম দিকে উত্তর আফ্রিকার শান্তি অক্ষুণ্ন ছিল। ৭৩৮ খ্রি. দিকে মৌরিতানিয়ায়, 'মোফারিয়া' নামে খারিজীদের একটি উগ্রপন্থীদল উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বার্বারদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং একটি রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ শুরু করে। এ সংবাদ পেয়ে খলিফা হিশাম সেনাপতি কুলসুমকে উত্তর আফ্রিকায় পাঠান। কিন্তু কুলসুম তাদের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। তার সেনাবাহিনীর একাংশ স্পেনে এবং অন্য অংশ কায়রোয়ানে ফিরে আসে। অবশেষে ৭৪২ সালে সেনাপতি হানযালা ইবনে সাফওয়ান উত্তর আফ্রিকার শাসনভার গ্রহণ করে বিদ্রোহী খারেজী ও বার্বারদেরকে 'মূর্তির যুদ্ধে' পরাজিত করে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

মধ্য এশিয়ায় অভিযান ঃ ককেসাস পর্বতের উত্তরে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান অঞ্চলে তুর্কী উপজাতি খাজারগণ প্রায়ই মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে তোলে। ৭২৭ সালে তারা একবার পারস্য ও আজারবাইজান আক্রমণ করে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তারা পুনরায় ৭৩১ সালে আর্মেনিয়া আক্রমণ করে আরব গভর্নর জাররাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এতে খলিফা হিশাম সাঈদ আল হাবসীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সাঈদ খাজারদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। খলিফা হিশাম ৭৩২ সালে ভ্রাতা মাসলামাকে এবং এক বছর পর মারওয়ানকে আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন। তারা উভয়েই খাজারদেরকে পর্যুদস্ত করেন। কিন্তু মাসলামা খাজারদের হাতে নিহত হন। মারওয়ান খাজারদের ঘাঁটি জর্জিয়া অধিকার করেন। এভাবে তুর্কী খাজার ও পার্বত্য অঞ্চলের নানা উপজাতিগণও মারওয়ানের বশ্যতা স্বীকার করেন।

স্পেন ও ফ্রান্সের ঘটনাবলী ঃ দামেস্ক হতে স্পেন বহুদূরে অবস্থিত বলে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থানরত খলিফার প্রতিনিধি সাধারণত স্পেনের শাসনকর্তা নিয়োগ ও সেখানকার প্রশাসনিক কার্যের দেখাশুনার ভার পেতেন। ৭২০ সালে তুলুমের যুদ্ধের পর সহকারী আরব সেনাপতি আবদুর রহমান স্পেনের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

দুর্ভাগ্যবশত পীরেনীজ গিরি সংকটে তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে স্পেনে প্রায় ৬ বছর যাবত অরাজকতা চলতে থাকে। অবশেষে ৭৩১ সালে আবদুর রহমান পুনরায় স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এ সময় পিরেনীজ পর্বতের অপরদিকে কার্ডানের মুসলিম শাসনকর্তা মুনুজা একুইটেনের ডিউক ইউডসের কন্যাকে বিবাহ করে শ্বশুরের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আবদুর রহমানের বিরোধিতা করেন। আবদুর রহমান মুনুজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতপর তিনি ইউডসকে পরাজিত করে একুইটেন বারগন্ডি প্রদেশ দখল করেন এবং ফ্রান্সের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। ইউডস আতংকিত ফরাসি সম্রাট চার্লস মারটেলের সাহায্যে তাঁর গতিরোধ করলে ৭৩২ সালে অক্টোবর মাসে টুরস নামক স্থানে উভয় দলে এক ভীষণ সংঘর্ষ হয়। মুসলিম শিবিরে দলীয় কোন্দল, লুঠতরাজ, সেনাপতির আদেশ অমান্য ও ভুল সংবাদ পরিবেশন করলে মুসলমানরা এ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধ ছিল ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের যুদ্ধ। মুসলমানগণ এ যুদ্ধে জয়লাভ করলে সমগ্র ইউরোপ তাদের পদানত হত।

খলিফা হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব

শাসন দক্ষতা ও রাজনীতি জ্ঞানে বংশের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ঃ খলিফা হিশামের শাসনামলের মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির চরম সীমায় পৌঁছে। আফ্রিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ এলাকাসহ সমগ্র আরব ভূখণ্ড তখন মুসলমানদের অধিকারে ছিল। কিন্তু তিনি এমন এক সময় সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন যখন মুদারীয় হিমরীয় সংঘর্ষ, খাজার তুর্কী, খারিজী, বার্বার বিদ্রোহ এবং উমাইয়া বংশের উৎখাতের জন্য শিয়া ও আব্বাসীয়গণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এ চরম বিপদে বিচলিত না হয়ে তিনি সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুদের মোকাবিলা করেন এবং প্রায় সকল বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য হন। দ্বিতীয় ইয়াযীদের পর তাঁর মতো সুযোগ্য উত্তরাধিকারী সিংহাসনে আরোহন না করলে সেই মুহূর্তেই উমাইয়া বংশ ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি মুয়াবিয়া, আবদুল মালিক এবং ওয়ালিদের মতো যোগ্য ও কীর্তিমান না হলেও পতনের যুগে উমাইয়া বংশের গৌরব প্রদীপ শেষবারের মত প্রজ্বলিত করতে পেরেছিলেন, এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, আবদুল মালিকের চতুর্থ পুত্র হিশামের সঙ্গে উমাইয়া বংশের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে। শাসন দক্ষতা ও রাজনৈতিক চাতুর্যে হিশাম মুয়াবিয়া এবং আবদুল মালিকের পর উমাইয়া বংশের তৃতীয় ও সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন।"

সন্দেহপরায়ণতা ও ধনলি□া ঃ শাসক হিসেবে তার চরিত্রে দু'টি মারাত্মক ত্রুটি লক্ষণীয়- একটি সন্দেহ পরায়ণতা অপরটি ধনলি□া। তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। এ জন্য দেখা যায়, তিনি শাসনকর্তাদের প্রায়ই বদলী করতেন। অর্থ লি□ার কারণে তিনি প্রজাদের কর বর্ধিত করেন এবং কৃষিজ দ্রব্যাদি খুবই চড়াদামে বিক্রি করতেন। তাঁর এ কুশাসন ও দুর্নীতির জন্য তিনি প্রজাসাধারণের কাছে অপ্রিয় হন এবং এ কারণে তাঁর রাজত্বকালে আব্বাসীয় আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ঃ ভনক্রেমারের মতে, "হিশাম ইবনে আবদুল মালিক প্রশ্নাতীতভাবে সুযোগ্য যোদ্ধা খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।" তিনি যেমন যোদ্ধা ছিলেন তেমন পণ্ডিতও ছিলেন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ সেলিম তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এরিস্টটলের কতিপয় গ্রন্থ তিনি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর পুত্র জাবালা ফরাসি ভাষায় লিখিত ইতিহাস আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন।

ধার্মিক ঃ তিনি ছিলেন আকিদা বিশ্বাসের প্রতি কঠোর এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুসারী। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি অনেক সুরম্য অট্টালিকা, প্রমোদ বাগান এবং রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি স্বভাবত ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক ছিলেন, তার দরবার পাপ, ব্যভিচার, অন্যায় প্রভৃতি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি রক্ষণশীল ছিলেন, তাই ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতবাদ সহ্য করতেন না। দীর্ঘ ২০ বছর যাবত উমাইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর ৭৪৩ সালে ৫৬ বছর বয়সে হিশাম মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দূরদর্শী ও মিতব্যয়ী ঃ হিশাম ছিলেন দূরদর্শী, মিতব্যয়ী, বুদ্ধিমান ও কূশলী খলিফা। রাষ্ট্রের ছোট ছোট বিষয়ও তাঁর জ্ঞাতব্যের বাইরে থাকত না। অফিসিয়াল কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর নীতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। তিনি অপব্যয়ের চরম বিরোধী ছিলেন। বৈধ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তিনি কার্পণ্য করতেন, ফলে সাধারণত তাঁকে কৃপণ মনে করা হত।

সাদামাটা জীবন ঃ হিশামের জীবন যাপন ছিল খুবই সাদামাটা। নৈতিক চরিত্র এবং অভ্যাসের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সহজ-সরল মেজাজের অধিকারী। তিনি বিলাসী ও বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এক কথায় উমাইয়া শাসনের মধ্যে হিশাম ছিলেন খুবই সফল বাদশাহ। হিশামের এ সাফল্য ছিল উমাইয়া শাসনের ভোর রাতের নিবু নিবু প্রদীপের শেষ দীপ্তি-যার জ্বালানি তেল ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিলো।

সার-সংক্ষেপ

হিশাম ৭২৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি উমাইয়া বংশের সর্বশেষ দক্ষ ও সফল খলিফা ছিলেন। এজন্য তাঁকে উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব বলা হয়। তিনি সিংহাসনে আরোহনের পর চরম রাজনৈতিক সংকটের মোকাবেলা করেন। এ সময় গোত্র কলহ, আব্বাসীয় আন্দোলন, খারিজী বিদ্রোহ, বার্বার ফ্রাঙ্কদের আক্রমণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ উমাইয়া শাসনের ভিত দুর্বল করে তোলে। দীর্ঘ বিশ বছর এই প্রতিকূল অবস্থার সাথে প্রাণপন সংগ্রাম করেও তিনি উমাইয়া বংশের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেননি। শাসক হিসেবে তিনি ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর খিলাফত কালে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির চরম সীমায় পৌছে। তার শাসনকালে পতনের যুগেও উমাইয়া বংশের গৌরববাতি শেষ বারের মত জ্বলে উঠে। এজন্য হিশামকে উমাইয়া বংশের শেষ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.১১

সঠিক উত্তরটি লিখুন-

১. খলিফা আবদুল মালিকের চতুর্থ পুত্র ছিলেন-
হিশাম/সুলায়মান/ওয়ালিদ
২. উমাইয়া বংশের খলিফাগণ প্রায় সকলেই যে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন তা হচ্ছে-
দলীয়/গোত্রীয়/বংশীয়।
৩. শাসক হিসেবে হিশামের চরিত্রের দু'টি মারাত্মক ত্রুটি ছিল-
সন্দেহ পরায়ণতা ও ধর্মলি□?// হিংসা ও জিঘাংসা।
৪. তাঁর দরবার মুক্ত ছিল-
পাপ-পঙ্কিলতা থেকে/জ্ঞানী-গুনী থেকে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা হিশামের পরিচয় দিন।
২. রাজ্য শাসনে হিশামের নীতি লিখুন।
৩. খলিফা হিশামের কোন কোন বিদ্রোহ দমন করেছিলেন?
৪. তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ১২ উমাইয়া আমলে শাসন, সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমাইয়া আমলের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন
- উমাইয়া যুগের সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- উমাইয়া আমলের সামরিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন
- উমাইয়া যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তুলে ধরতে পারবেন
- উমাইয়া আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

খুলাফায়ে রাশেদার পর উমাইয়া শাসনামল ইসলামের গণতান্ত্রিক দিক থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছিল। এ সময় ইসলামি শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল বটে, তবে তা ছিল ব্যক্তি ও গোত্রে কেন্দ্রীভূত। ইসলামি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি চালু ছিল। উমাইয়া বংশের শাসনামলের একটি সংক্ষিপ্ত আলেখ্য তুলে ধরা হল।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা

উমাইয়া যুগ হতেই রাজতন্ত্র শুরু হয়। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইসলামি গণতন্ত্রের পরিবর্তে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মাধ্যমে রাজতন্ত্র চালু করেন। এর ফলে খলিফার বড় ছেলেই পরবর্তী শাসকরূপে মনোনীত হতেন। উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময় ছাড়া উমাইয়া আমলে মজলিসে শুরার গুরুত্ব কমে যায়। উমাইয়া আমিরগণ খুলাফায়ে রাশেদীনের সরল-সহজ জীবন-যাপন ত্যাগ করে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন শুরু করেন।

এ সময়ের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা উন্নত ছিল। মুয়াবিয়া ডাক বিভাগ চালু করেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা চালু হয়। আরবি ভাষার ব্যাপক প্রচলন হয়। আরবি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। কেন্দ্রে পাঁচটি প্রশাসনিক বিভাগ থাকত- (১) দীওয়ানুল জুনদ বা সামরিক বিভাগ, (২) দীওয়ানুল খারাজ বা রাজস্ব বিভাগ, (৩) দীওয়ানুল রাসাইল চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদান বিভাগ, (৪) দীওয়ানুল খাতাম বা শীল মোহর বিভাগ, (৫) দীওয়ানুল বারীদ বা ডাক বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের কাজ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যার কারণে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

উমাইয়া শাসনামলে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য গোটা সাম্রাজ্যকে ৫টি আঞ্চলিক বিভাগে ভাগ করেছিল। এগুলো হল ঃ

১. হেজাজ, ইয়ামেন মধ্য আরব এর, রাজধানী ছিল মক্কা।
২. মিসর বিভাগ, এর রাজধানী ছিল ফুসতাত।
৩. ইরাক, ওমান, বাইরাইন, ফিরমান, সিস্তান, খোরাসান, ট্রান্স অক্সিয়ান, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ নিয়ে পূর্বাঞ্চল বিভাগ গঠিত ছিল, এর রাজধানী ছিল কুফা।
৪. জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং এশিয়া মাইনের কিছু অংশ নিয়ে মধ্য এশিয়া বিভাগ গঠিত ছিল- এর রাজধানী ছিল মসুল।
৫. উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, সিসিলি, সার্ডিনিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল বিভাগ গঠিত হয়েছিল, কায়রোয়ান ছিল এ বিভাগের রাজধানী।

এ পাঁচটি আঞ্চলিক বিভাগ আবার ১৪টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। আবার প্রত্যেক প্রদেশে ছিল বেশ কয়েকটি জেলা। প্রদেশগুলো ছিল ঃ

১. আরব ২. ইরাক ৩. সিরিয়া, ৪. মিসর ৫. আলমাগরিব ৬. প্রাচ্য প্রদেশ, ৭. জার্জিয়া ৮. আদ-ডাইলাম ৯. আল-বিহার, ১০. আল-জিবাল ১১. খোজিস্তান, ১২. ফারস ১৩. কারমান ১৪. সিন্ধু।

খলিফা প্রত্যেক আঞ্চলিক বিভাগের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একজন ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। বিভাগের রাজনৈতিক ও সামরিক শাসন কাজের জন্য ভাইসরয় খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। ভাইসরয় খলিফার অনুমতিক্রমে তাঁর অধীনস্থ প্রদেশে ওয়ালী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। ওয়ালী তার কাজের

জন্য ভাইসরয়ের কাছে প্রত্যক্ষ এবং খলিফার নিকট পরোক্ষভাবে দায়ী ছিলেন। কেন্দ্রের অনুকরণে প্রত্যেক প্রদেশেও দিওনানুল জুনদ, দিওয়ানুল রাসায়েল, দিওয়ানুল খারাজ এবং দিওয়ানুল কারিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওয়ালী ছাড়াও আমিল, সাহিবুল খারাজ, কাতিব, সাহিবুল আহদাস ও কাজী ছিল উল্লেখযোগ্য প্রাদেশিক কর্মচারী জেলার প্রশাসনিক প্রধানের পদবী ছিল অমিল।

রাজস্ব ব্যবস্থা

উমাইয়া আমলে খুলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় রাজস্ব আয়ের বিভিন্ন খাত ছিল। যেমন যাকাত, খুমুস, উশর, জিযিয়া, খারাজ, ফাই ইত্যাদি বিভাগ ছিল। অন্যান্য কর ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এ সময় আরবগণ অনারব দেশে জমি কেনার অনুমতি পায়। নও মুসলিমদের থেকেও উমর ইবনে আবদুল আযীয ছাড়া অন্যান্য খলিফা জিযিয়া নিত। সরকারি বাইতুল মাল থেকে সাম্রাজ্যের কল্যাণে ব্যয় করা হত। মসজিদ, পানীয় জল, ভেড়ীবাধ, স্নানাগার, রাস্তা-ঘাট, কূপ, বাঁধ নির্মাণ করা হত। উমাইয়া খলিফাগণ বাইতুলমালকে নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল যা ইসলামি নীতির পরিপন্থী ছিল।

সামরিক ব্যবস্থা

উমাইয়া আমলে সামরিক ব্যবস্থার অনেক উন্নত ছিল। ইসলামের সমৃদ্ধির সাথে সাথে উমাইয়া আমলে সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও শৃংখলা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত বাহিনীতে ১০ জন, ৫০ জন, ১০০ জন, ও ১০০০ জন নিয়ে একটি সেনা ইউনিট গঠিত হত। প্রতিটি ইউনিটের একজন সেনাধ্যক্ষ থাকত। সামরিক বাহিনীতে বেসামরিক কর্মচারী ও বিভিন্ন কাজ যেমন- কোষাধ্যক্ষ, বেতন প্রদানকারী ও সংবাদ বাহক ইত্যাদি। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) আমলে একটি সুগঠিত নৌবাহিনী ছিল। বাইজানটাইনের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধে মুয়াবিয়ার নৌ-বাহিনী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। আবদুল্লাহ বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে ৬০টি নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। খলিফা ওয়ালিদের সময় নৌ-শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মুসলিম নৌ-বাহিনী স্পেন, সিন্ধুসহ আরও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জয় করেন।

সামাজিক ব্যবস্থা

উমাইয়া শাসনামলে সামাজিক কাঠামো ছিল সাধারণত নিম্নরূপ ঃ

১. অভিজাত শ্রেণী ঃ রাজবংশ, আমির উমারা, আমলা, সেনাপ্রধান বিজেতাগণ এবং উচুঁ বংশের আরব মুসলমানগণ এই অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমাজের সবচেয়ে উচুঁতে অবস্থান করতেন শাসক শ্রেণী। তাঁদের জীবন ছিল অধিকাংশই জাঁকজমক পূর্ণ ও বিলাসবহুল। অবশ্য উমর ইবনে আবদুল আযীযসহ আরও কিছু খলিফা সাধারণ জীবন যাপন করতেন। প্রশাসনিক আমলা ও উজীর আমির উমারা ও সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারের জীবন প্রণালীও ছিল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ।

২. মাওয়ালী বা নব দীক্ষিত মুসলমানগণ ঃ অনারব মুসলমানদেরকে বলা হত মাওয়ালী। আরবীয় মুসলমানদের পরেই তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল। ইসলাম গ্রহণের ফলে আইনত তাঁরা সম অধিকারের অধিকারী হলেও কার্যত তাদেরকে ততটা মর্যাদা দেয়া হয়নি। সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং ইসলামের বিভিন্ন সেবায় মাওয়ালী মুসলমানদের অবদান ছিল সীমাহীন। তাদের কাছ থেকে জিযিয়া ও খারাজ আদায় করা হত। অবশ্য উমর ইবনে আব্দুল আযীয এ বৈষম্য নীতি তুলে দেন। মাওয়ালীদের প্রতি উমাইয়াদের বৈষম্য নীতির ফলে তারা উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে। ইসলামি শিক্ষায়, দীক্ষা- জ্ঞান-বিজ্ঞানে মাওয়ালী মুসলমানদের অবদান অসামান্য।

৩. জিম্মী বা অমুসলিম সম্প্রদায় ঃ ইসলামি সাম্রাজ্যে অমুসলিম সম্প্রদায় তথা ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক এবং অন্যান্য আশ্রিত অমুসলমানগণ ছিলেন জিম্মী। তারা ছিলেন সমাজে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। তারা সেনাবাহিনীতে যোগদান করত না। তাদের জান-মালের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হত। এজন্য নিরাপত্তা কর হিসেবে জিযিয়া কর দিতে হত। চাষাবাদ কর হিসেবে তারা ভূমি কর খারাজ দিত। রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলে তারা সকল প্রকার স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার ভোগ করত। তাদের বিচার-আচার তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে করা হত। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজকার্যে নিযুক্ত হত। তারা সমাজে সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। তারা কোন উৎপীড়ণের শিকার হত না। সরকারি অর্থে তাদের গীর্জা ও মন্দির পুনর্নির্মিত হয়েছে।

৪. দাস সম্প্রদায় ঃ সমাজে তখনও দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান ছিল। মহানবী (স) দাসত্ব প্রথাসমূহের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেননি। মহানবীর (স) নির্দেশ ছিল দাসদের সাথে সদয় ব্যবহারে করা। দাসদের অবস্থার উন্নতির জন্য মহানবী (স) অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। উমাইয়া শাসনামলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বন্দীগণই দাস রূপে গণ্য হত। সাম্রাজ্যের বিস্ত

তির কারণে দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা রাজ পরিবার, ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পরিবারে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হত। দাসদের জীবন এ যুদ্ধে কষ্টকর ছিল না। তাঁরা অনেক মানবিক অধিকার ভোগ করত। ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাসগণ অভূতপূর্ব ও অসাধারণ পদমর্যাদা লাভ করেছিল। তারা সেনাপতি হতে শুরু করে সাম্রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছিল। ঐতিহাসিক ডাউটি দাসদের অবস্থা সর্বদা সহনীয় এবং প্রায়শই সুখকর ছিল বলে মন্তব্য করেছেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

উমাইয়া আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। এ যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে বিপুলভাবে। এর সাথে ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময়ে কবিতা, বক্তৃতা, লিপিবিদ্যা, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, তর্ক বিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময়ে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক বিকাশ লাভ করে। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক শাস্ত্রসমূহ যেমন- তাফসীর, কিরআত, হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে গভীর গবেষণা হতে থাকে এবং এসব শাস্ত্র স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশ লাভ করে। উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময় হাদীস সংকলিত হয়। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ও ফিকহবিদগণ হাদীস ও ফিকহর উপর ব্যাপক কাজ করেন।

ভাষা সাহিত্য, সংস্কার শাস্ত্র, ব্যকরণ শাস্ত্রেরও উন্নতি হয়। এ আমলেই পবিত্র কুরআনে নোকতা ও হরকত সংযোজন করা হয়। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ অনুমোদিত হয়। এ সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। মসজিদ, মক্তব, ব্যক্তিগত পাঠশালায় পড়ালেখা চলত। তবে এক একজন মনীষীদের ব্যক্তিগত পাঠশালাগুলো এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ছিল। এ সময় কিতাব পত্রের সংরক্ষণ শুরু হয়। ফলে লাইব্রেরির ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাদের সময়ে রাজকীয় কুতুব খানাও ছিল। এ সমস্ত কুতুবখানায় বই পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল।

কবিতা ঃ প্রাক ইসলামি যুগ ছিল কবিতার যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যদিও এর কিছু ধারা ও নিয়ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু কুরআনের আবির্ভাবের দ্বারা তা ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রের নিকট সকল কবির কবিতার আগ্রহ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। উমাইয়া যুগে কবিতার সেই হারানো ঐতিহ্য আবার ফিরে পেল। উমাইয়া খলিফাগণ কবিদের সম্মান দিলে ঐতিহ্য আবার ফিরে পেল। উমাইয়া খলিফাগণ কবিদের সম্মান দিতে লাগলেন, কবিদের দ্বারা রাজ দরবার অলংকৃত হতে লাগল। খলিফার প্রশংসায় কবিতা রচনা করলে পারিতোষিক মিলত। এমনিভাবে কবিতার আসর পুনরায় জমজমাট হয়ে উঠল। আখতাল, জরীর, ফারাযদাক, আশা, নাবেগা প্রমুখ ছিলেন উমাইয়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।

ইতিহাস ঃ বনী উমাইয়া যুগে ইতিহাস রচনার সূচনা হয়। নবী করীম (স) ও তার প্রধান প্রধান সাহাবীদের কার্যাবলী জানার জন্য তারা ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হন। সাহাবী এবং তাবেয়ীনগণ ইতিহাস বর্ণনা করতেন। তাবেয়ীনদের মধ্য হতে যাদের বর্ণনা গ্রহণীয় ছিল তারা হলেন ওরওয়া ইবনে জুবাইর, শরাহবীল ইবনে সায়াদ, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ, আকরামাহ, মাওলা ইবনে আব্বাস, আছেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদাহ, ইমাম জুহরী, মুসা ইবনে ওকবা ইবনে রাশেদ। তারা ছিলেন উমাইয়া যুগের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। কেউ কেউ ইতিহাসের উপর পুস্তক ও রচনা করেছিলেন। ওরওয়া ইবনে জুবাইর সর্বপ্রথম মাগাজী ও সীরাত [যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাসূলুল্লাহ (স) জীবন চরিত্র]-এর উপর ইতিহাস পুস্ত ক রচনা করেন। কিন্তু ইমাম সুহাইলী বলেন, ইমাম জুহরী ইতিহাসের উপর প্রথম বই লিখেন। কিন্তু সর্বপ্রথম সব চেয়ে নির্ভরশীল ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। মুয়াবিয়া (রা) নিজে ইতিহাস চর্চার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। আরব দেশের প্রতিদিনের যুদ্ধ, পুরাতন ইতিহাস, অনারব বাদশাহদের অবস্থা, তাদের রাজ্য পরিচালনার ধরন, বিভিন্ন রাজ বংশের উত্থান-পতন এ সমস্ত ঘটনা তিনি রীতিমত শুনতেন। তার সময়ের একজন ইয়ামানী বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উবাইদ ইবনে শরবাহ তাকে এ সমস্ত ঘটনা শুনাতেন।

বক্তৃতা ঃ উমাইয়া যুগে বক্তৃতা বিদ্যার বেশ উন্নতি সাধন করে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় বক্তৃতা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। কাজেই ঐ যুগে বেশ কিছু বক্তার আবির্ভাব ঘটে। যেমন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছাকাফী, তারিক ইবনে জিয়াদ উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। তাছাড়া মুহাম্মদ ইবনে কাসেম ও অন্যান্য প্রায় খলিফাই বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন।

লিপি বিদ্যা ঃ উমাইয়া যুগে বিভিন্ন দফতরের কার্যাবলী ব্যাপকতা লাভ করে। আবদুল মালিক আরবিকে সরকারি ভাষা হিসেবে চালু করেন, যার কারণে আরব-অনারব সকলকেই বাধ্য হয়ে আরবি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল। দফতরের হিসাব পত্রের জন্য আরবি চর্চা আরবি লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এভাবে উমাইয়া যুগে আরবি লিখন ও লিপির বেশ উন্নতি সাধন করে।

তাফসীর শাস্ত্র ঃ উমাইয়া যুগে তাফসীর শাস্ত্রের বেশ অগ্রগতি হয়। যদিও তাফসীর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়; তবুও উমাইয়া যুগে বড় বড় পণ্ডিত জন্ম নেয়ার কারণে তাফসীর বিদ্যা বেশ উন্নতি সাধন করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর ছাত্র রশীদ, ইকরামা, কাতাদাহ প্রভৃতি ছিলেন উমাইয়া যুগের খ্যাতনামা তাফসীরকার, তবে উমাইয়া যুগের তাফসীর হয়ত বর্তমান কালের তাফসীর গ্রন্থের মত ছিল না।

ক্বিরাত ঃ কুরআন-মজীদ পাঠ রীতিও একটি বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক ভাষার মতই কুরআন মজীদের কিছু কিছু শব্দ কোন কোন এলাকা বা গোত্রের লোক বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করে থাকেন যা অর্থের কোন পরিবর্তন করে না। এমনিভাবে সাত ক্বারীর সৃষ্টি হয়। এ প্রসিদ্ধ সাত ক্বারী উমাইয়া যুগেই প্রবর্তিত হয়।

হাদীস ঃ উমাইয়া যুগে সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের। এ যুগে হাদীসের প্রতি মানুষের অসাধারণ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন এলাকায় হাদীস চর্চার আসর বসত। এক এক হাদীস শুনার জন্য মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে দূর-দুরান্তে পাড়ি জমাত। হাদীস চর্চার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র ছিল মদীনা। ইমাম ইবনে শিহাব জুহরী হাদীস অন্বেষণের লক্ষ্যে মদীনার অলি-গলি ঘুরে ফিরতেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে হাদীস গ্রহণ করতেন। পূর্ণ জানাশুনা এবং বর্ণনাকারীর জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি, পরহেজগারী ইত্যাদি বিবেচনা করে হাদীস গ্রহণ করা হত। হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে বড় অবদান হল হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের। তিনি সরকারি উদ্যোগে হাদীস সংকলনের ব্যবস্থা করেন। এভাবে উমাইয়া শাসনামলে হাদীসের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া শাসন আরম্ভ হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা) উমাইয়া বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। উমাইয়া শাসন ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৯০ বছর কাল স্থায়ী হয়। উমাইয়া শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের বিপুল বিস্তার ঘটে। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কার ধর্মভিত্তিক গণতান্ত্রিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়। জনগণের দ্বারা খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরিবর্তে খলিফাগণ তাঁদের পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনীত করার প্রথা চালু হয়। বাইতুল মালের সম্পদ জনগণের। কিন্তু এ সময়কার শাসকগণ তা ব্যক্তিগত সম্পদের মত ভোগ ব্যবহার করেন। খলিফাগণই ছিল ক্ষমতার অধিকারী। জনগণের কাছে জবাবদিহিতা ছিল না। শাসন, বিচার ও সামরিক বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করতেন খলিফাগণ। খুলাফায়ে রাশেদীনের মত সাদা সিধে জীবন যাপনের পরিবর্তে তাঁরা জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবন শুরু করেন। তাঁদের সমাজ সভ্যতার অর্থনীতি যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাধারণ মানুষ কম বেশি সুখে-শান্তিতেই বসবাস করত। আইন-আদালত কুরআন সুন্নাহভিত্তিক চলত। সামগ্রিক বিবেচনায় উমাইয়ার শাসন আমল ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য উন্মেষ ঘটে তা আব্বাসীয় আমলে পূর্ণতা লাভ করে। শাসন ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে এ সময়কে একটি সোনালী যুগের প্রারম্ভিকা বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.১২

এক কথায় উত্তর দিন-

১. কোন আমল থেকে রাজতন্ত্র শুরু হয় এবং কে ইসলামে রাজতন্ত্র চালু করেন?
২. কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগগুলো কি কি?
৩. উমাইয়া যুগে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য গোটা সামাজ্য কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয় এবং কয়টি প্রদেশে ছিল?
৪. কার আমলে মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠিত হয়? এবং উৎকর্ষ সাধিত হয় কোন সময়ে?
৫. উমাইয়া আমলে কোন কোন গোষ্ঠীর লোকেরা অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ছিল?
৭. জিম্মি বলতে কি বুঝেন?
৮. শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্র উমাইয়া আমলে বিকাশ লাভ করে?
৯. সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করেন কোন মনীষী?
১০. সরকারী উদ্যোগে কোন খলিফা হাদীস সংকলনের ব্যবস্থান করেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. উমাইয়া শাসনামলের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দিন।
২. উমাইয়া যুগের সামাজিক কাঠামো বর্ণনা করুন।
৩. উমাইয়া যুগের সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৪. উমাইয়া যুগের রাজস্ব ব্যবস্থা তুলে ধরুন।
৫. উমাইয়া আমলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্বন্ধে বর্ণনা করুন।

উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমাইয়া খিলাফত কি কি কারণে পতন ঘটেছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন
- উমাইয়াদের পতনের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন।

ভাঙ্গা-গড়া, জন্ম-মৃত্যু ও উত্থান-পতন চিরন্তন নিয়ম। উমাইয়া বংশের লোকেরাও চিরাচরিত নিয়মের বহির্ভূত নয়। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া শাসন ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে যাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। উমাইয়া বংশের লোকেরা প্রায় ৯০ বছর কাল শাসন করেছিলেন।

উমাইয়া বংশের পতনের কারণসমূহ

১. প্রাকৃতিক নিয়ম ঃ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, "যে কোন রাজবংশের স্থিতিকাল একশ বছর এবং ক্ষমতাসম্পন্ন রাজবংশকেও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা, বিকাশ এবং ক্রম অবনতি ও পতন এ নির্দিষ্ট অধ্যায়সমূহকে অতিক্রম করতে হবে।" ইবনে খালদুন বর্ণিত নীতি অনুসারে উমাইয়া বংশ স্বাভাবিক স্থিতিকাল অতিক্রম করে প্রাকৃতিক নিয়মে এর পতন ঘটে।

২. ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত ঃ হযরত আলী (রা)-কে খিলাফাত থেকে বঞ্চিত করে বলপূর্বক ক্ষমতা নেয়ার অর্থ হচ্ছে আদর্শে আঘাত হানা। উমাইয়া খলিফাদের ইসলামের মৌলিক আদর্শের উপর আঘাত তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৩. রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ উমাইয়া খিলাফতের পতনের অন্যতম কারণ ছিল গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র প্রবর্তন; ন্যায়-নিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণ খিলাফাতের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বায়তুলমালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৪. খলিফাদের অযোগ্যতা ও বিলাসিতা ঃ উমাইয়া বংশের মু'আবিয়া, আবদুল মালিক, প্রথম ওয়ালিদ, দ্বিতীয় উমর এবং হিশাম ছাড়া অন্য সকল খলিফাই ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য ও আড়ম্বর প্রিয়। এ অযোগ্য শাসকদের আমলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাঁদের দুর্বলতা ও বিলাসবহুল জীবনই উমাইয়া বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৫. সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব ঃ খিলাফাতের উত্তরাধিকারী নিয়োগের সুষম ও সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবই উমাইয়া বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। উত্তরাধিকার নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় সিংহাসন নিয়ে পিতা-পুত্র-ভ্রাতা ও আমীর-উমরাহদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বেঁধে থাকত। যার দরুন উমাইয়া বংশের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬. চরিত্রহীনতা ঃ মু'য়াবিয়া ও উমর ইবনে আবদুল আযীয ছাড়া উমাইয়া বংশের অন্যান্য খলিফাগণ চরিত্রহীন ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। ফলে তারা জনগণের সহানুভূতি হারায়।

৭. মন্ত্রীদের অদক্ষতা ও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা ঃ উমাইয়া বংশের পতনের অন্যতম কারণ ছিল মন্ত্রীদের অদক্ষতা ও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা। মন্ত্রীরা সুযোগ পেলেই ক্ষমতার অপব্যবহার করত এবং শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে সেনাপতিদের মাঝে দুর্নীতি ঢুকে পড়ে। ফলে উমাইয়া বংশের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

৮. আরব-অনারব বৈষম্য ঃ উমাইয়া শাসনে অনারবদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ ও মনোভাব উমাইয়া বংশের পতনের অন্যতম কারণ। ভনক্রেমার বলেন, "অন্য যে কোন ঘটনা অপেক্ষা শাসিত প্রজাদের প্রতি উমাইয়া খলিফাগণের বিমাতাসূলভ আচরণ উমাইয়া বংশের অস্তিত্বকে বিপদসংকুল করে তুলেছিল।"

৯. হযরত আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতি দুর্ব্যবহার ঃ খলিফা দ্বিতীয় উমর ছাড়া অন্যান্য উমাইয়া খলিফাগণ হযরত আলীর বংশধরদের উপর মুজআর নামাযের খুতবায় অভিশাপ ও কুৎসা রটনা করে। মহানবী (স)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি এহেন দুর্ব্যবহারে অন্যান্য মুসলমানগণ উমাইয়াদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

১০. গণ-সমর্থনের অভাব ঃ উমাইয়া শাসকগণ খুলাফায়ে রাশিদীনের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে তারা গণসমর্থন হারিয়ে ফেলে। তাই কোন রাজবংশই শুধুমাত্র সামরিক শক্তির উপর বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

১১. বার্বারদের বিদ্রোহ ঃ উত্তর আফ্রিকার বার্বার জাতির পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ ও গোলযোগ সৃষ্টি করে উমাইয়া বংশের অস্তিত্ব মারাত্মক আঘাত হানে।

১২. মুদারীয় এবং হিমারীয় গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ঃ বার্নাড লুইস বলেন, "যে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় উমাইয়া শাসনের পতন হলো তা ছিল আরব গোত্রসমূহের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা।" মুদারীয় এবং হিমারীয়দের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব উমাইয়া শাসকগণ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়।

১৩. উমাইয়া ও হাশিমী গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ঃ হাশিমী গোত্রের প্রতি উমাইয়া গোত্রের হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব উমাইয়া বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

১৪. সাম্রাজ্যের বিশালতা ঃ উমাইয়া শাসনামলে পূর্বে সিন্ধু থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। এ বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে প্রাদেশিক শাসকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

১৫. রাজকোষ শূন্য ঃ উমাইয়া বংশের পতনের অন্যতম কারণ ছিল রাজকোষ শূন্যতা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে উমাইয়া খলিফাগণ বিলাসিতা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন। ফলে বিভিন্ন সময়ে প্রজাদের উপর নানা প্রকার অবৈধ কর ধার্য করা হয়।

১৬. শি'য়া ও খারিজীদের বিদ্রোহ ঃ শি'আদের বিরোধিতা উমাইয়াইদের পতনের অন্যতম কারণ। উমাইয়ারা আলীর বংশের লোকদের প্রতি নির্যাতন ও হত্যা শুরু করে। খারিজীগণ ছিল উমাইয়াদের চিরশত্রু। শি'আদের বিরোধিতা ও খারিজীদের বিদ্রোহ উমাইয়া পতনকে ত্বরান্বিত করে।

১৭. আব্বাসীয় আন্দোলন ঃ আব্বাসীয়গণ প্রচার করতে লাগলেন যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর এবং হযরত আলীর বংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে গিয়ে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মারওয়ানকে হত্যা করে আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

সার-সংক্ষেপ

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এ পৃথিবীতে যে জাতি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যখন নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে, তখন ধ্বংসের হাত থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। তার পতন অনিবার্য। এমনিভাবে উমাইয়া সাম্রাজ্যের গৌরব রবি চিরতরে অস্তমিত হল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.১৩

সত্য-মিথ্যা নিরূপন করুন

১. উমাইয়া বংশের লোকেরা প্রায় ১৯০ বছর কাল রাজত্ব করেন।

২. ইবনে খালদুনের মতে যে কোন রাজবংশের স্থিতিকাল একশ বছর।

৩. উমাইয়াদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র বনাম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৪. উমাইয়া শাসকগণ হযরত আলীর (রা) বংশধরদের সাথে দুর্ব্যবহার করার কারণে জনগণ খুশী হয়েছিল।

৫. শিআদের বিরোধিতা উমাইয়াদের পতন ডেকে আনে।

বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে হযরত মুয়াবিয়ার ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. হযরত মুয়াবিয়ার রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩. হযরত মুয়াবিয়ার শাসন ব্যবস্থা এবং তাঁর কৃতিত্ব ও চরিত্র আলোচনা করুন।

৪. কারবালার বিষাদময় ঘটনার কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

৫. উমাইয়া শাসন দৃঢ়ীকরণে খলিফা আব্দুল মালিকের অবদান বর্ণনা করুন।

৬. খলিফা ওয়ালিদের বিজয়াভিযানের বিবরণ দিন।

৭. খলিফা ওয়ালিদের কৃতিত্ব ও চরিত্র বর্ণনা করুন।

৮. খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসন নীতি ও সংস্কার বিশ্লেষণ করুন।

৯. উমর ইবনে আব্দুল আযীযের চরিত্র মূল্যায়ন করুন। তিনি উমাইয়া বংশের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী?

১০. খলিফা হিশামের কৃতিত্ব ও চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

১১. উমাইয়া শাসনামলের শাসন ব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশ সম্বন্ধে বিবরণ দিন।

১২. উমাইয়া রাজবংশের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করুন।